অবশেষে

ইমরান মাহমুদ

বই: অবশেষে
লেখক: ইমরান মাহমুদ
গ্রন্থস্বত্ব: লেখক
প্রচ্ছদ: ফকির আল মামুন
প্রথম প্রকাশ: ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
প্রকাশনী: দাঁড়িকমা প্রকাশনী
দ্বিতীয় প্রকাশ: ১ মার্চ ২০১৯
প্রকাশনী: পিডিএফ প্রকাশনী

Book: Obosheshe
Author: Imran Mahmud
Price: 160 BDT

ISBN: 978-984-511-072-3

উৎসর্গ

জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক আমার বাবা ও সর্বশেষ আশ্রয় মহীয়সী নারী আমার মা কে

প্রিভিউ

ছাত্রজীবনের সর্বশেষ স্তর বিশ্ববিদ্যালয়। বলা যায় এখানেই চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় একজন ছাত্রের ভবিষ্যৎ। ছাত্র-ছাত্রীরা মনের মত করে তাদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলেন। কেউ হোন শিক্ষক, কেউ সাংবাদিক, কেউ আবার সরকারী ও বেসরকারী খাতের বিভিন্ন কর্মকর্তা। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপকভাবে চর্চিত হওয়া একটি বিষয়ের নাম ছাত্ররাজনীতি। দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিবিদরা বহুলাংশে এই ছাত্ররাজনীতির সিঁড়িতে পা রেখেই বেড়ে উঠেন । আর এই উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে নব্বইয়ের দশকের পর থেকে বর্তমান সময়কার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতির স্বরূপ ও দর্শন। রাজনীতির মধ্যদিয়ে বেড়ে উঠা একজন ছাত্রের রঙ-বেরঙের ক্যারিয়ার, সফলতা ও ব্যর্থতার কথা তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসটির বিভিন্ন চরিত্রে। অত্যন্ত নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে ক্যাম্পাসে বিদ্যমান বিভিন্ন দল-মতের সহাবস্থান ও বিরোধের গল্প। সাথে সাথে সরলভঙ্গিতে বলা হয়েছে যুগ যুগ ধরে চোখের আড়াল হয়ে থাকা অনেক তিক্ত সত্য।

বটতলা গ্রামের নিম্ন মধ্যবৃত্ত পরিবারের তৃতীয় ছেলে রনি। বড় দুই ভাই বিবাহিত । তন্মধ্যে বড়জন কৃষি কাজ করে বাবার সাথে আর দ্বিতীয় জন চাকুরি করে গাজিপুরের একটি গার্মেন্টস ফেক্টরিতে । রনির ছোট আরো একটি বোন আছে। বোনটি সবার ছোট তথা পঞ্চম। তার নাম রুবি। রনির খুব আদরের। দেখা হলেই নানান কিছুর বায়না ধরে এই পাঁচ বছরের রুবি। বেশির ভাগ সময়ই তার পক্ষে ছোট বোনের বায়না পূরণ করা সম্ভব হয় না । তারপরও রনি কেমন যেন অনুভব করে তার কাছে

আরো বেশি বেশি বায়না ধরুক। আদর করে মিটি মিটি হেসে রুবিকে ফাঁকি দিয়ে অন্য দিকে মন ভুলিয়ে চলে যাওয়ার মধ্যে যে কী স্বর্গীয় সুখ,সেটা বুঝার ক্ষমতা বিধাতা কেবল রনিদেরই দিয়েছে।

স্কুল থেকে মাত্র কলেজে পা রেখেছে রনি। টাকার অভাবে বড় দুই ভাই পড়ার সুযোগ পায় নি। শুধু যে টাকার অভাবেই পড়াশোনা করেনি তা কিন্তু নয়। বাবার ও যথেষ্ট বুঝের ঘাটতি ছিল। বাবা এখন যেমন পাশের বাড়ির দুই একজনকে দেখে শিক্ষা নিয়েছে, এই শিক্ষাটা যদি রনির ভাইদের সময়ে নিতে পারত তাহলে হয়ত রনির বড় ভাইয়েরাও রনির মত না হলেও এর কাছাকাছি যেতে পারত। স্কুল থেকে কলেজে পড়াশোনার খরচ বেশি; এটা রনির পরিবারের সবাই মনে মনে অনুধাবন করে, তবে বাস্তবে নয়। কিন্তু কী করার আছে, প্রায় বৃদ্ধ বাবার তেমন আয় রোজগার নাই বলেলেই চলে। আর বড় দুই ভাইয়েরও তো ঘরে বউ আছে। প্রত্যেকের দুই দুইটা করে বাচ্চা । যাদের চাচ্চু ডাক প্রতিনিয়তই রনিকে শুনতে হয় খুব ধৈর্য সহকারে। ভাইদের স্বপ্ন তাদের ছোট ভাই একদিন অনেক বড় হবে। তাদেরকে টাকা পয়সা জোগান দিবে এবং একদিন বড় একটি চাকুরি পেয়ে পরিবারের ও সমাজের নাম উজ্জ্বল করবে। অভাব অনটন থাকবে না।
সবই ঠিকাছে কিন্তু রনির মাস শেষে যা প্রয়োজন রনি অবশেষ তা আর পায় না। বন্ধুদের কাছ থেকে ধার কিছু না কিছু করতেই হয়। ভাল ছাত্র হিসাবে রনির বেশ সুনাম আছে এলাকায়। যেহেতু আট দশ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে রনিই কেবল এস.এস.সি.তে এ প্লাস পেয়েছিল। কম টাকা হলেও গ্রামের অনেক ছেলে-মেয়েরাই রনির কাছে পড়তে আসত। রনিও পড়াত; অন্তত মাস শেষে যে ধার দেনাটা করতে হয় তা পরিশোধ করা যায় কোন রকমে ।

দিন গুলো ছুটে চলে বিজলির গতিতে। আজকের তুলনায় যেন আগামীকালটা অতিবাহিত হয় শতগুণ বেগে। রনির কাছে কখনো মনে হয়, দিন গুলি এত দ্রুত চলে যাচ্ছে কেন? আবার কখনো মনে হয়, কখন মাস শেষ হবে? রনি প্রতিদিনই পঞ্জিকার পাতায় হিসাব করে ৩০ তারিখ হতে আর কত দিন বাকি।

রনির কলেজ জীবন চলছে। একমাস পরেই ফাইনাল পরীক্ষা শুরু। জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় তার সামনে উপস্থিত। দিন রাত অনেক কিছু চোখে দেখেও না দেখার ভান করে পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে যাচ্ছে সে । কারণ, তার মনে একটি সুপ্ত অস্পষ্ট স্বপ্ন উঁকি ঝুঁকি মারত মাঝে মাঝে। পাশের বাড়ির এক চাচাচ ভাই ছোট কাল থেকে বাবা মায়ের সাথে ঢাকায় থাকে। শুনেছে সে নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে । গতবছর ঈদে বাড়ি এসেছিল ঐ চাচাত ভাই। বাড়ি আসার পর কথা হয় রনির সাথে। চাচাত ভাই জানতে পারে রনি এস.এস.সিতে এপ্লাস পেয়েছিল এবং ইন্টারমিডিয়েটেও ভাল করার আত্মবিশ্বাস আছে। তাই সে রনিকে দেশের সেরা বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। প্রথমত রনির কাছে মনে হয়েছিল যেন সে আজাইরা কিছু গল্প শুনছিল। কথা বলার এক পর্যায়ে রনি চাচাত ভাইয়ের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চায়। চাচাত ভাই অল্প সময়ের মধ্যে তাকে সাধ্যমত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করে। কিছুটা উৎসাহ আর উদ্দীপনা নাড়া দিয়ে উঠে রনির মধ্যে। জেগে উঠে নতুন করে নতুন কিছু স্বপ্ন। সে জানেনা কী করে সেখানে যেতে হবে। কোন পথটি পাড়ি দিয়ে তাকে মহাসমুদ্রটি জয় করতে হবে। কারণ, ইতিমধ্যেই কথা বলার ফাঁকে দিয়ে সে জেনেছে এখানে ভর্তি হতে গেলে অনেক প্রতিযোগিতা করে ভর্তি হতে হয়। সব ছাত্ররা এখানে ভর্তি হতে কোচিং সহ আরো অনেক কিছু করে এখানে । এস.এস.সি এর পর থেকেই বাবা মা রা তাদের সন্তানদের কে এই পথে পাড়ি দেয়ার স্বপ্ন দেখায়। আগে থেকেই দুধ কলা দিয়ে ছেলে-মেয়ের

স্বাস্থ্য ঠিক রাখার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রাখে। কিন্তু রনি তো শুনল এই মাত্র; এক মাস পরই তার ফাইনাল পরীক্ষা। এর দুই তিন মাস পরই এডমিশন পরীক্ষা । কীভাবে কী করবে সে। আর শুনেছে কোচিং করতে নাকি অনেক টাকা খরচ। কোচিং ফি, প্রাইভেট, থাকা খাওয়ার টাকা সব কিছু মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যা আসে তার পরিমাণ রনি শুধু গণিত কষার সময়ই খাতায় লিখেছে । বাস্তবে হিসাব করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি কখনো। এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে রনি তার চাচাত ভাইয়ের কাছ থেকে বাড়ির পথে পা বাড়াচ্ছে। তার স্বপ্ন তাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে আবার অন্যদিকে বাস্তবতা তাকে সামনে যেতে বারণ করছে। কী করবে সে, কী করা উচিত তার। যাহোক, সবশেষে রনির একটা সিদ্ধান্ত মাথায় স্থির হল- তাকে আগে এইচ.এস.সি পরীক্ষাটা ভালকরে দিতে হবে। তারপর যা হওয়ার হবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত কিছু চিন্তা করার কোন সুযোগ নেই। তাকে সামনে যে পথ সেটাই আগে পাড়ি দিতে হবে।

এইচ.এস.সি পরীক্ষা প্রায় শেষ পর্যায়ে; মাত্র একটি পরীক্ষা বাকি আছে। রনির মাথার মধ্যে যে আসমানটি এতদিন চাপা দিয়ে রেখেছিল সেটি তার দ্বিগুণ চেহারায় চাপ প্রয়োগ করছে। কী করবে তারপর? একই প্রশ্ন বারবার ঘুরে ফিরে আসছে। শুনেছে বন্ধুদের কেউ কেউ এডমিশন কোচিং এ ভর্তি হয়েছে, যারা আগে রনির সাথে একই স্কুলে পড়ত, এখন শহরের কলেজে পড়ে; তাদের অনেকেই ।

কোন এক দুপুরের সূর্যকে মাথায় নিয়ে রনি তার শেষ পরীক্ষাটার সমাপ্তি ঘটিয়ে বাড়ি ফিরছে। তার ছায়া তার থেকে তখন অনেক ছোট হয়ে সাথে সাথে হাটছে। সেদিন রনির পেটে ক্ষুধা কম। চিন্তা গুলো মাথা থেকে ক্ষুধার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। ধীরে ধীরে বাড়ি আসে রনি। নিদ্রা আর

ক্লান্তিতে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ততক্ষণাৎ ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল রনি। ঘুম ভাঙ্গার পর খুবই দুর্বল মনে হচ্ছিল। অন্ধকার দেখাচ্ছিল চারদিক।

পরদিন বড় ভাইদের একজন রনিকে প্রশ্ন করল তারপর কোথায় পড়তে হবে । নাকি পড়াশোনা শেষ? সংসারের আলোর মুখ দেখাতে পারবে সে? আর কোন কষ্ট ক্লেশ থাকবে না । রনি এবার সাহস করে ভাইয়ের সামনে মুখ খুলল। তার এখন যা করা উচিত বিস্তারিত বলে বুঝানোর চেষ্টা করল। বড় ভাইয়ের নিরুপায় চাহনি আর অক্ষমতার অসহায়ত্ব রনি একবার স্বপ্ন ভঙ্গের কথা ভেবেছিল আবার তৎক্ষণাতই আগের অবস্থানে ফিরে এসে বলল, কোন টেনশন করার প্রয়োজন নেই; একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এত দিন যেভাবে চলছে সামনের দিনগুলোতেও হয়ত আল্লাহ একটা ব্যবস্থা করবেন। এই বলতে বলতে রনি একটা পরিকল্পনার ছক মাথার মধ্যে অংকন করে ফেলেছে।

অনেক কষ্ট করে পাশের বাড়ির ঐ চাচাত ভাইয়ের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করল রনি; যিনিই প্রথম রনিকে এই পথের পরিচয়টা দিয়েছিলেন। চাচাত ভায়ের সাথে কথা বলার পর জানতে পারল কোচিং থেকে যে গাইডটি তাকে দিয়েছিল তার কাছে সেটি আছে। গাইডটিতে ভর্তি পরীক্ষায় যা আসে তার নমুনা ব্যাখ্যা মোটামোটি করে সবিস্তারে দেয়া। পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ। গাইডটি পাঠিয়ে দিল বড় ভাই। রনি গাইড খুলে আল্লার নাম নিয়ে পড়া শুরু করল। যা হবে হোক। দিন রাত শুধু পড়া। গাইড শেষ করতে হবে। নানান জটিলতা আর অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা পর্যন্ত গেল রনি। সে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামই শুনেছে তাও আবার তার চাচাত ভাইয়ের সুবাদে । তাই তার স্বপ্ন ছিল শুধু মাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে ।

এক সপ্তাহ পর রেজাল্ট প্রকাশ করবে বিশ্ববিদ্যালয়। কোন চিন্তা কাজ করছে না তার মধ্যে । কারণ পরীক্ষা দেয়ার সময় জনতার যে ঢল সে লক্ষ করেছে এতে করে সে ভেবেই নিয়েছে তার এই পড়ায় কোন কাজ হবে না। যেখানে বাবা মা তার ছেলেকে গাড়ি থেকে দুই হাত ধরে পরীক্ষার হল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায় ; এমন ছাত্রের সংখ্যা হাজার হাজার। আর সেখানে রনি পরীক্ষার পাঁচ মিনিট আগে অনেক কষ্টের বিনিময়ে পরীক্ষার হল পর্যন্ত যেতে পেরেছে । কোন মত হাপিয়ে ফুঁপিয়ে পরীক্ষার এক ঘন্টা পার করেছে। কিন্তু তার পরীক্ষা খারাপ হয়েছে না ভাল হয়েছে এটা বুঝার সুযোগ হয়নি। কারণ পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে সঠিক উত্তরের ব্যাপারে যার সাথেই কথা বলেছে, করোর কাছ থেকে কোন স্পষ্ট ধারণা পায়নি। তবে রনির মনে আশার জায়গাটা হল, রনি প্রশ্নের এনসার কম দাগিয়েছে ও প্রশ্ন বুঝারও তেমন ফুরসত মেলেনি এই অল্প সময়ে। কিন্তু যা এনসার করেছে বইয়ের আলোকে একটাও ভুল হয়নি।

.

একটু পরেই রেজাল্ট প্রকাশ করার কথা। নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে কোন কিছুর খবর পাওয়া যাচ্ছেনা। কয়েকবার চেষ্টার ফলে হঠাৎ মোবাইলে মেসেজ আসল। মেসেজটি পড়েই রনি এক দৌড়ে তার বড় ভাইয়ের কাছে চলে গেল। কিছু বুঝে উঠার আগেই তাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে অশ্রুপাত করে নিল। এই মুক্তা ঝরানো কান্না ও কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম হাসির মাঝে যে কি সংবাদ আছে তা বুঝার জন্য কোন পড়া শোনার প্রয়োজন নেই, নেই কোন বই খাতার ইলম। দরকার একটি দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা ও সফলতা দেখার স্বপ্ন। রনির বড় ভাই জানেনা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কী আছে। কী হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে। কিন্তু এটা

অনুমান করতে পেরেছে যে, সফলতার সিঁড়িটা সম্ভবত রনি খুঁজে পেয়েছে। যাহোক, পরক্ষণই রনি তার চাচাত ভাইকে ফোন করে খবরটা জানাল। যার বই পড়ে রনির আজ এই সফলতা, যার কাছেই শুনতে পেয়েছিল রনি প্রথম কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। আসলে রনি তার গুরুত্ব ভালমতে তখন বুঝতে পেরেছে যখন চারদিক দিয়ে ফোন আসা শুরু হয়েছে। রনি ভাবতেও পারছে না যে এত লোকের কাছে রনির মোবাইল নম্বর আছে। চেনা অচেনা কত আত্মীয় প্রতিবেশি! রনির যে এত আত্মীয় স্বজন আছে রনি সেদিনিই কিছুটা কল্পনা করতে পেরেছ। নতুন নতুন অনেক আত্মীয়ের নামও সেদিন শিখতে পেরেছে যা ইতিপূর্বে বই-কিতাবে পায়নি।

ভাইভাতে সাবজেক্ট হিসাবে আইন পেয়েছে রনি। এক বন্ধুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভর্তির বাকি কাজটা সম্পন্ন করল। সূর্যসেন হলে সিট পেয়েছে। মাস্টার দা. সূর্যসেনের নামে এই হলের নামকরণ করা হয়েছে। রনি এই সূর্যসেনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এডমিশন পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় সংক্ষেপে পড়েছে। তখন তার মনে সূর্যসেন সম্পর্কে কৌতূহল জেগেছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে রনিকে সেই সূর্যসেন নামের হলেই থাকতে হবে। বিষয়টা ভাবছে আর ভিতরে ভিতরে সে আনন্দে কুটি কুটি হয়ে যাচ্ছে। এডমিশনের প্রস্তুতির সময় আরো কত লোকের নাম যে মুখস্ত করেতে হয়েছে! কত জায়গার নাম, কত কী!

জানুয়ারীর ১ তারিখ থেকে ক্লাস শুরু। পনের দিন বাকি। দিনগুলো বাড়িতেই কাটছে রনির। হতাশার বিন্দু মাত্রও তার মধ্যে নেই। থাকার ব্যবস্থা তো ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই হয়ে গেল। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড

বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেকের জন্যই হল রয়েছে। প্রত্যেকেই কোন না কোন হলে থাকার সুযোগ পান। আর খাওয়ার ব্যবস্থা করা তো তেমন কঠিন না। জীবনে বহুত টিউশনি করিয়েছে। ওখানে গিয়েও দু একটা টিউশনি করাবে না হয়। গ্রামে থেকে তিনটা চারটা ব্যাচ পড়িয়ে নিজের খরচ নিজে চালিয়েছে। আর এখন তো ঢাকায় ; নাহ! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এসব ভাবনা নিয়ে তার দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম আর অনিশ্চয়তার গল্পকে উপসংহার দিতে শুরু করেছে। গ্রামের লোকজন কেউ বলছে - তুমি নাকি সচিব হবে?' কেউ বলছে, তুমি নাকি এস.পি হবে?' কেউ কেউ বলছে প্রফেসর ইত্যাদি। সে আসলে কী হবে তার ভাবার আগেই তার সমাজের লোকজন তার মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। নতুন আবিস্কৃত আত্মীয় সমূহের মধ্যে এক আত্মীয়ের বাসায় দাওয়াত পেল। হাতে সময় অনেক, কখনো এমন সুযোগ হয়নি তাই অনেক উৎসাহ নিয়েই গেল তাদের বাড়িতে। ভোজন-কথন শেষ হওয়ার এক পর্যায়ে বাড়ি ফিরার সময় ঐ আত্মীয় আঙ্কেল বললেন, "বাবা তোমার ভাইয়েরা তো কিছু করতে পারেনি, তোমার বাবা মূর্খ মানুষ। তুমি হয়েছ গোবরে পদ্ম ফুলের মত। অনেক ভাল করতে হবে। আজকাল পড়াশোনা অনেকেই করে । ভাল চাকুরি সবাই পায় না। আমি আশা করব তুমি বড় সরকারী চাকুরি পাবে। বিসিএস ক্যাডার হবে। তোমার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন , সমাজের মুখ উজ্জ্বল করবে। বিশ্ববিদ্যালয় অনেক খারাপ জায়গা। মারামারি হয়। কাটাকাটি হয়। ছাত্ররা রাজনীতি করে। শিক্ষকরা রাজনীতি করে। অনেক পথ সেখানে আছে। প্রত্যেকটি পথের গন্তব্য ভিন্ন। কোনটার সাথে কোনটার মিল নেই। একশ্বাসে একগাদা উপদেশ থেকে রনি তার আঙ্কেলের দুটি কথা স্মরণ রাখতে পেরেছে। তন্মধ্যে একটি আগে কিতাবে পড়েছে যার বাস্তব প্রয়োগ আজ দেখতে পেরেছে ; সেটি হল- গোবরে পদ্ম ফুল। আরেকটি হল তার জন্য সম্পূর্ণ নতুন- বিসিএস ক্যাডার।

কাল ডিসেম্বরের ২৯ তারিখ। হল যেহেতু বরাদ্দ আছে আগেই, তাই ক্লাসের পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য দুদিন আগেই রওয়ানা হওয়ার চিন্তা করল। যত সমস্যাই থাকুক না কেন রনি কখনো ক্লাস ফাঁকি দেয়নি। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে তো কল্পনাই করা যায় না। সবার থেকে আগের দিনই বিদায় নেয়া শেষ। কারণ, আগামীকাল ভোরেই তাকে গ্রাম ছাড়তে হবে ঢাকার উদ্দেশে। তাই পরদিন ফজর হওয়ার দু ঘন্টা আগেই গোসল করে কাপড় চোপড় গোছিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে নিল।

ঘরের সবাইকে বিদায় জানিয়ে মহাসড়কের দিকে হাটা শুরু করেছে রনি। সাথে আছে তার বড় ভাই। কিছুক্ষণের মধ্যে তার ভাইকেও বিদায় জানানোর সময় এসে পড়ল। বাসস্ট্যান্ড থেকে টিকিট কেটে বাসে পা দিয়ে সালাম করে সিটে গিয়ে বসল আর জানালার ফাঁক দিয়ে দেখছিল, ভাইয়ের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত আশার দৃষ্টি যেন রনির নিজের স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে। কিন্তু পরক্ষণই কিছু সময়ের আবর্তনে গতির বাস্তবতায় চোখের আড়াল হয়ে গেল সবকিছু। সা সা করে বাস সামনের দিকে এগুচ্ছে। ক্রমে ক্রমে পুরোই আপছা হয়ে পড়ল পেছনের সবকিছু।

ক্যাম্পাসে পা রাখতেই রনির মনটা এক সূক্ষ্ম শিহরণে কেঁপে উঠল। শরীরটাও কাঁটা দিয়ে উঠেছে। আনন্দ ও অচেনার ভয় উভয়ই কাজ করছে। হাটতে হাটতে ঠিক হলের সামনে এসে উপস্থিত। বিভিন্ন ধরণের লোকজন আসা যাওয়া করছে। চাচাত ভাইয়ের সাথে কথা বলে আগেই সূর্যসেন হলের এক বড় ভায়ের নম্বর পেয়েছিল রনি। প্রথমে হলের এই বড় ভাইয়ের রুমে যাবে তারপর তার নিজের বরাদ্দকৃত রুমে গিয়ে থাকা শুরু করবে। হল গেইট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে ভাবছে নিজের মত করে বেড ও টেবিল চেয়ার বসিয়ে কাল থেকেই পড়া শুরু করতে হবে। আর বড়

ভাইয়ের রুমে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। আজ বিকাল অবধিই নিজের রুমে চলে যেতে হবে। একটু বিশ্রাম নিতে যতটুকু সময় নিবে ততটুকুই। ভাবনার এক পর্যায়ে গেইট পাড়ি দিয়ে হলের ভিতরে প্রবেশ করল। সাথে সাথে একটু অবাকই হল রনি। আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো বাহির থেকে যেমন মনে হয় ভিতরে যে ভিন্ন আরেক জগৎ সেটি চোখে না দেখলে বুঝা যায় না। প্রথমে গেস্ট রুম; মানে অতিথি শালা। এখানে অতিথিরা এসে বসেন; তাদেরকে আপ্যায়ন করা হয়। বাড়ি থেকে কোন আত্মীয় স্বজন আসলে প্রথমে এখানে এসে অপেক্ষা করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর হল অপিস, পত্রিকা পড়ার কক্ষ, রিডিং রুম ,খাওয়ার ডাইনিং, মসজিদ, ক্যান্টিন তথা ধীরে ধীরে সবই চোখে পড়ল। কোন কিছুই বাদ নেই। সেলুন লন্ড্রি ও আছে । তার মানে, কোন কিছুর জন্য বাহিরে তেমন যাওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু ক্লাস ছাড়া সব প্রয়োজনই মোটামোটি ভিতরে সমাধান করা সম্ভব ।

৪০১ নম্বর কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে বাহির থেকে নক দিল রনি। রুমটি রুবেল ভাইয়ের; রনির চাচাত ভাইয়ের বন্ধু। অনুমতি পেয়ে ভিতরে ঢুকল। বসে একটু স্বস্তির নিশ্বাস নেয়ার পর পরিচয় পর্বটা সেরে নিল। কথা বলার একপর্যায়ে রনি জানতে পারে বড় ভাইও আইন বিভাগে পড়ে। রনি একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করতে থাকে। তার কাছে মনে হয়েছে আল্লাহ দয়া করে আসতে না আসতেই একজন ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে কিনা নিজ ডিপার্টমেন্টের। রুমে তাকিয়ে দেখে রনি আর তার বড় ভাই ই শুধু; আর কেউ নেই । জানতে চাইল, -রুমে কি আপনি একাই থাকেন?
একটু অবাক ও কৃত্রিম হাসির সহিত রুবেল ভাই উত্তর দিল,
-না।
রনি- তাহলে কয়জন? দুই জন ??

এবার রুবেল ভাই অবাক ও হাসি কিছুই প্রকাশ না করে তৃতীয়বারের প্রশ্নকে রুদ্ধ করার জন্য আগ বাড়িয়ে উত্তর দিলেন,

-নাহ! ৬ জন।

কিছুটা বিস্মিতই হল রনি। কি করে সম্ভব একটা রুম, এখানে রুবেল ভাইকে একাই বেশ মানাচ্ছে। একজনের জায়গায় দুজন থাকা যায় কিন্তু ছয়জন কীভাবে থাকে! কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না বিষয়টি। রুবেল ভাইয়ের চুপ থেকে কোন উত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে অবতরণ করার ঘটনাটি রনির তাৎক্ষণিক বোধগম্য না হলেও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ বুঝে আসতে বেশি সময় লাগেনি।

সারাদিনের সফরে রনির ক্লান্ত শরীরটি আবেগ আর উৎসাহের জোরে অনেকদূর পর্যন্ত টিকে থাকলেও এক পর্যায়ে এসে রুবেল ভাইয়ের বিছানার উপর এলিয়ে পড়ে। নিদ্রায় ডুবে যাওয়া নিষ্পাপ চেহারাটি রুবেল ভাইয়ের চোখে লাগতেই তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ে গেল। তৎক্ষনাৎ টেবিলের উপর থাকা আয়নাটি হাতে নিয়ে নিজের চেহারাটার সাথে সদ্য আসা প্রথম বর্ষের ছেলেটার চেহারা একনজর মিলিয়ে নিল। তিন বছরের ব্যবধানে কত পরিবর্তন চলে এসেছে একই চেহারাতে! স্মৃতিগুলো একপলকে চারণ করে আয়নাটি টেবিলের উপর রেখে দিয়ে ধপাস করে বিছানার এক পাশে বসে পড়ল রুবেল। কোন এক অজানা ক্লান্তির আবেশে তাকেও বিছানায় এলিয়ে দিয়েছে অবশেষে।

রাত আটটা বাজে তিরিশ মিনিট। রনি তার বড় ভাই রুবেলের সাথে তার নিজ কক্ষের দিকে রওয়ানা হচ্ছে। যে কক্ষে রনির স্বপ্ন বুনন করা হচ্ছিল। ফোনে কথা বলতে বলতে রুবেল তার জুনিয়র এক ছোট ভাইকে

সাক্ষাতে পেল। তারপর রনির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে দিল আমার ছোট ভাই; ওরে একটু রুমে উঠাইয়া দিস। ছেলেটির নাম রাসেল। ২য় বর্ষের ছাত্র। অনেক জটপট কথা বলে। দ্রুত হাটে। রাসেলের হাতে তুলে দিয়েই রুবেল রনির কাছ থেকে বিদায় নিল। বলল, 'কোন সমস্যা হলে ভাইকে বলিও।' এটাই রনির সাথে শেষ কথা ছিল রুবেলের। তারপর কোন দিন রুবেল ভাইয়ের সাক্ষাৎ রনি পায়নি। রনিকে সাথে নিয়ে রাসেল হাটছে। ফাঁকে ফাঁকে নাম পরিচয়টাও জেনে নিয়েছে রাসেল। কিন্তু রনি আগের মত রুবেল ভাইকে যেভাবে পাল্টা প্রশ্ন করে অনেক কিছু জেনে নিয়েছিল এখন আর তেমন জানতে পারছে না। কেমন যেন সংশয় কাজ করছে তার মধ্যে । গলা শুকিয়ে যাচ্ছে বারবার। তারা দুজন হাটছে রনির রুমের দিকে।

২২৬/ক নং রুম। রুমের সামনে এসে দাঁড়াল রাসেল ও রনি। রাসেল- এটা তোমার রুম; আপাতত এখানে কয়দিন থাক। কয়েকদিন পর অন্যরুমে শিফট হয়ে যাবা। আর এখানে যারা আছে সবাই তোমার ইয়ারমেট ফ্রেন্ড। সবার সাথে মিলে মিশে চলবা। এই বলতে বলতে দুজনে দরজা ধাক্কা দিয়ে রুমে প্রবেশ করল। রাসেল ভাইকে দেখে রুমের ভিতরে থাকা সবাই আচমকা দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে একে একে হ্যান্ডশেক করতে লাগল। কিন্তু এখানে এত লোক কেন? রনি মনে মনে ভাবছে। এখানে তো থাকবে ছয়জন । রাসেল ভাইতো ছয়জনের কথাই বলছিল তখন! এসব ভাবতে ভাবতে রনি একনজরে গণনার কাজটাও সেরে ফেলল। যোগ বিয়োগ করার পর ফলাফল আসল বিশ জন।
বন্ধুরা সবাই হাসি খুশি। কারোর মধ্যে বিষন্নতা বা মনক্ষুন্ন ভাব বলতে কিছুই নেই। যে যার মত যা ইচ্ছা তাই গলা ফাটিয়ে বলে যাচ্ছে। কোন বাধা নিষেধ নেই। সামান্য সময়ের মধ্যেই রনির সাথে রুমে অবস্থান করা আঠার বিশ জন ছেলের পরিচয় হয়ে গেল। শুধু পরিচয়ই না; 'তুই' সম্বোধন থেকে শুরু করে অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন সব

রকমের আচরণই রনি বন্ধুদের কাছ থেকে এই দশ পনের মিনিটের ব্যবধানে পাচ্ছে। কী অদ্ভুত! এতক্ষণ যে বিশজনের হিসাব ছিল তার সামনে এখন কাঁথার ভেতর থেকে মাথা বের করে আরো দুই জন সংখ্যার হিসাবটা বিশ থেকে বাইশে তুলে দিল। রুমের সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন। এক সপ্তাহের মধ্যেই সবার আগমন । কিন্তু সবাই সবার নাম অতি মনযোগের সাথে মনে রাখার চেষ্টা করছে। শুধু নামই নয় ডিপার্টমেন্ট ও জেলা সহ। রনিও মোটামোটি কিছুক্ষণের মধ্যে অনেকের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে। তার পরিচয় ও সবার ঠোটে মুখস্ত হওয়া শেষ। কেউ পশ্চিমে কেউ পুবে-উত্তরে-দক্ষিণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কেউ উপুড় হয়ে মোবাইল টিপছে। কয়েকজন আবার তাস খেলছে। কেউ গান গাচ্ছে। সব কিছু স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে রনির কাছে। স্বপ্নের মধ্যে ইচ্ছা করলেই এক ঘটনা থেকে অন্য ঘটনায় যাওয়া যায় না। বরং স্বপ্ন তার নিজের গতিতে ঘটনার প্রবাহ পরিবর্তন করে। মানুষ শুধু বিভোর হয়ে থাকে স্বপ্নের মধ্যে। রনির মাথার মধ্যে আর টেবিল চেয়ারের কথা বা কল্পনা নেই। কোন পাশে তার বেড থাকবে কোন পাশে থাকবে তার পড়াশোনার টেবিল। কিছুদিন পর টিউশনি করিয়ে একটা বইয়ের আলমিরা কোন পাশে রাখবে সেটাও রনির ভাবনায় অনুপস্থিত। কারণ সে তো এখন **গণরুমের** মাঝে বিভোর হয়ে আছে। চাইলেই সে তার চিন্তার প্রবাহকে পরিবর্তন করে নিজের মত করে চালাতে পারবে না। সব কিছু যে একই তালে চলছে ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয়, এত উল্লাস কোলাহল, হৈ-হোল্লর এর মধ্য দিয়ে অনেক্ষণ পর দু তিন জনকে পাওয়া গেল যাদেরকে একটু চুপচাপ মনে হচ্ছে। রনি ভাবল হয়ত তারাও তার মত আজ নতুন এসেছে এই রুমে।

দশটা বাজার পাঁচ মিনিট বাকি। হঠাৎ সবার মধ্যে যেন ভিন্ন এক ভাবনা নাড়া দিয়ে উঠেছে। এক যুগে সবাই সবার দিকে তাকানো শুরু করেছে। এই যে দশটা বাজার মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি! এই তোর নাম কী? এই তোর ডিপার্টমেন্ট কোনটা? তোর জেলা যেন কোনটারে বন্ধু? ইত্যাদি

ইত্যাদি। কেউ পেন্ট পড়ছে। কেউ শার্ট বদলাচ্ছে। এতক্ষণ রনি সবার মধ্যে যেমন একটি নিশ্চিন্তার বায়ু প্রবাহিত হতে দেখছিল এখন যেন ঠিক উল্টা; সবার মধ্যে এক চিন্তার শিহরণ জেগে উঠছে। সবাই নিজেকে সিরিয়াস হিসাবে প্রস্তুত করছে। রনির কৌতূহল গুলো বিরক্তিতে পরিণত হচ্ছে ধীরে ধীরে, তারপর ভয়। আসলে এমন কেন বিষয়টা, কেন এমন করছে। সবাই এখন সিরিয়াস। নিজেকে সাজাতে ব্যস্ত সবাই। দশটা বাজার একমিনিট বাকি থাকতে সবাই দল বেঁধে একে অপরকে ডেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে। সবার পিছনে পিছনে রনিও ছুটছে। জীবন সংগ্রামে লড়াই করে অভ্যস্ত রনি প্রতিযোগিতায় সামনে থাকা তার জন্য কোন ব্যাপারই না। কিন্তু সবাই যে দল বেঁধে সবাই নিচে নামছে, আর সে পিছনের সারিতে, এখন কি তাকে সবার থেকে এগিয়ে সামনে সারিতে থাকতে হবে না? অবশ্য পিছনেও তারমত ধীরগতি সম্পন্ন ছেলেরা আছে। রনির হাটার গতি একবার বাড়ছে আরেকবার কমছে। বন্ধুদের ক্ষিপ্র গতি দেখে তার কেমন কেমন যেন মনে হচ্ছে। সবাই হল গেইটের দিকে যাচ্ছে। নাহ, হল গেইট নয় তার একটু আগে গেস্ট রুম তথা অতিথি কক্ষ। হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ল সকলে। শঙ্কা আর দুশ্চিন্তা সবার চেহারাকে আবৃত করে রেখেছে। বিভিন্ন রুম থেকে আরো অনেক ছাত্র আসতে শুরু করল। গেস্ট রুমে বসার জায়গা যা ছিল তাতে বসার পর বাকিরা দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কয়েকজনের আগমনে সবাই দাঁড়িয়ে গেল। সবার মধ্যে এক ধরণের নড়াচড়া দিয়ে উঠল।

- কী খবর, তোরা কেমন আছিস? কিরে তোরা এমন মন মরা হয়ে আছিস কেন? তোদের মত যখন ছিলাম পুরা ক্যাম্পাস চষে বেড়াতাম। এখানে সেখানে ঝগড়া লাগাতাম, ইত্যাদি। তোদের কোন সমস্যা নেই তো?

সকলের সমস্বরে উত্তর-

- জ্বি না ভাই।

-মিলেমিশে থাকবি। কেউ কোন বিপদে পড়লে সবাই উদ্ধার করবি। আর যে কোন প্রবলেম হলে আমাদেরকে জানাবি। আমরা তোদের ফেমিলির

বড় ভাইয়ের মত। আমরা যারা হোসেন ভায়ের রাজনীতি করি সবাই একটি পরিবার। আমাদের হলের সভাপতি হোসেন ভাই হল পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের হিরু। সবাই শ্রদ্ধা করে চলে। কথাগুলো কয়েক জনের গলায় কয়েক ভাবে বাজতে শুরু করল। রনি কিছু প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছিল আবার নতুন করে কিছু প্রশ্ন মনে উদয় হচ্ছিল।

-এই তোরা সবাই সবার নাম জানিস তো? এই তুই এদিকে আয়। সামনে আয়; এই এখানে দাঁড়া। এদিক থেকে দশ জনের নাম বল সাথে ডিপার্টমেন্ট। ছেলেটি রনির সাথেই ছিল। মনে হয় যেন তাকে চিলে ছোঁ মেড়ে নিয়ে গেল রনির পাশ থেকে। শতভাগ সন্তুষ্টিজনক উত্তরে ব্যর্থ হওয়ায় একজন বলছে, এই তুই কবে হলে উঠছিস। এতদিন লাগে এই কয়েকটা নাম শিখতে? আরো যা তা --- হঠাৎ একজন চটে গিয়ে তাকে থাপ্পর দেয়ার জন্য তেড়ে আসছিল। কাঁপছিল ছেলেটি। যারা তাকে এমনভাবে শাসন করছে তারা সবাই দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। কেবল প্রথম বর্ষ শেষ করে সেকেন্ড ইয়ারে পা রেখেছ। সেদিন ঘটনাটি দেখে রনির চোখ বন্ধ গিয়েছিল। তারপরেই রনির পালা শুরু হতে পারে। যা ভাবনা তাই ঘটনা। রনির ডাক পড়ল বড় ভাইদের মুখে। আগের জনের মতই তাকেও সামনে নেওয়া হল। রনির বেলা ঘটনা আরো ভয়াবহ। প্রশ্ন আগেরটিই; যেই প্রশ্ন দিয়ে আগের জনের পরীক্ষা হয়েছিল সেটিই বহাল রয়েছে। কিন্তু এবার এক বড় ভাই আগেই রনিকে মারার জন্য উন্মোখ হয়ে আছে। রনি যাই দু একজনের নাম বলতে পারত ভয়ে কারোর নামই মনে করতে করতে পারছিল না । ব্যগ্র ভঙ্গিতে ধেয়ে আসতেই আরেকজন বড় ভাই বলছে, এই থাম সে আজ নতুন হলে উঠেছে। তাকিয়ে দেখে রাসেল ভাই। রনি আজ ক্লান্ত দুপুরে ঘুমানোর সময় কোন স্বপ্ন না দেখলেও ঘুম থেকে জাগার পর এখন পর্যন্ত পুরোই স্বপ্নের মধ্যে নিমজ্জিত আছে। ক্ষণিক সময়ের জন্য কিছুটা ঘৃণার উন্মেষ ঘটলেও পরক্ষণে রাসেল ভাইয়ের প্রতি মনে মনে এক ধরণের কৃতজ্ঞতা তৈরি হয়। প্রথম দিন গেস্ট রুমে এসেছে, তাই নিয়ম অনুযায়ী রনি সবার

সামনে নিজের নাম, ডিপার্টমেন্ট ও নিজ জেলার নাম বলেছে। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলাতে সবার কাছ থেকে আরেকধাপ শাসানী খেয়েছে রনি।
- বড় ভাইদেরকে ভয় পাও কেন? তারা কি বাঘ-ভাল্লুক নাকি? তারা তোমার সবচেয়ে আপন। ইত্যাদি ইত্যাদি।
বিষণ্ন মন নিয়ে রনি রুমে নিজেকে একা করে রেখেছে। রাতে ডিনার করেনি । তার কাছে মনে হচ্ছে এখানে পড়ার চেয়ে গ্রামের কোন কলেজে পড়াই অনেক ভাল ছিল। প্রথম দিনেই যদি এমন হয় তাহলে পরের সময় গুলো কাটাবে কিভাবে সে। ভিতরটা ফেটে দুই টুকরো হয়ে যাচ্ছে তার এসব ভাবতে ভাবতে। এদিক দিয়ে চলছে আড্ডা, তাস আর গল্প। কারোর মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। মনে হচ্ছে যেন ওরা সবাই এসব কিছু বিনোদন হিসাবে নিয়েছে। এতসব বকাঝকা গালি- গালাজ কিভাবে সহে! একজনেরও কোন কষ্ট নেই। রনি এখনও চিন্তা করতে পারছে না একদিন সেও এমন প্রতিক্রিয়াহীন হয়ে যাবে। কোন চেতনা ভাবনা কষ্ট বেদনা তার মধ্যে থাকবে না। দিব্যি সব সহেও যেতে পারবে সে।

রাত দুটা বাজে তিরিশ মিনিট। হঠাৎ ঘরির কাটার দিকে চোখ দিয়ে রনি চমকে উঠে। কি অবাক কাণ্ড! কারোর মধ্যে কোন ঘুমের চিহ্ন মাত্র লক্ষ করা যাচ্ছে না। তাহলে সবাই ঘুমায় কখন? একটু একটু করে রনি তার মনটাকে শক্ত করে পাশে বসে থাকা বন্ধুর সাথে কথা বলা শুরু করল। যেকোন বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে নিজেকে সামলে নেয়ার অভ্যাস রনিকে জীবনে বহুবার করতে হয়েছে। এখন পারবে না কেন? বন্ধুর নাম সজল।
বন্ধু, তুমি কবে আসছ হলে? সজল উত্তর দিল, এই তো এক সপ্তাহ হল। সাথে সাথে পাল্টা প্রশ্ন করে সজল জানতে চাইল তুমি কবে উঠেছ। রনি উত্তর দিল এই তো আজই। রনি বুঝতে পারল, সে প্রথম প্রথম যখন রুমে এসেছিল তখন সজল ছিল না। তাহলে তো রুমে আরো একজন

সদস্য বাড়ল; মানে তেইশ জন। যাহোক, দুই বন্ধু কথা বলছে। এক পর্যায়ে জানতে চাইল রনি- রুমের সবাই ঘুমায় কখন? সজল উত্তর দিল এটার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। কখনো তিনটা কখনো চারটা কোনদিন আবার ভোরের আলোর চারদিকে যখন ছড়ানো শুরু হয় তখন থেকে ঘুম শুরু। রনি একটু চোখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল রাত আড়াইটা বাজে কিন্তু এখনো রুমের সব বন্ধুরা নেই। পাঁচ ছয়জন কে অনুপস্থিত দেখা যাচ্ছে। রনি সজলকে জিগাস করল,

- তুমি ঘুমাও কখন?

সজল: আমি হলে উঠার পর রাতে ঘুমাইনা। ফজর নামাজ পড়ে একবারে সকাল থেকে ঘুম শুরু করি। তিনটা চারটায় ঘুমালে ফজর নামাজ পড়া যায় না। এখনও ক্লাস শুরু হয়নি। ক্লাস শুরু হলে কষ্ট করে হলে ও রাত ১২ টার মধ্যে ঘুমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সজলের কথা গুলো ছিল খুবই সাধারণ কিন্তু তার প্রতিটি কথার প্রভাব রনির মনের গভীরে দাগ কেটে যাচ্ছে। মনে হয় যেন অনেক আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা গুলো বলছে। সুন্দর ফুটফুটে চেহারাটা কী মায়া দিয়ে তৈরি! কত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলে সে। আর সে নামাজ পড়ার জন্য নাকি রাতে একটুও ঘুমায় না। রনি ও নামাজ পড়ে; তবে নিয়মিত না। যখন সময় হয় বা মনে চায় তখনই পড়ে। আর জুম্মার নামাজ সাধারণত কখনো কাজা করে না রনি। কিন্তু সারা রাত না ঘুমিয়ে একমাত্র ফজর নামাজের জন্য সজাগ থাকার কথা শুনে রনি একটু অবাক হয়েছে। জীবনে কত সংগ্রামই না করেছে সে। কিন্তু সজলের এই সংগ্রাম যেন সকল সংগ্রামকে পিষে দিয়েছে।

দীর্ঘ আলাপচারিতার পর রনির সাথে সজলের ভাল একটা বন্ধুত্ব তৈরী হয়েছে। সজলের মত এত মিশুক ছেলে রনি জীবনে কখনোই দেখেনি। সজলের বাবা কলেজের অধ্যাপক। তার মা গৃহিণী তবে অনেক শিক্ষিতা মহিলা। নানান কথার ভিতর দিয়ে সজল রনির জীবনের অনেক তথ্য ইতিমধ্যেই জেনে গেছে। রনি ও জেনেছে টুকটাক যা সে বলেছে। রুমের

এক কর্নারে একপেশে হয়ে শুয়ে শুয়ে দুজন কথা বলছিল অন্যদিকে রুমের বাকি ছেলেরাও ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে উঠছিল।

ক্ষণিক পর ক্ষীণ আওয়াজে মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি ভেসে আসছিল মসজিদ থেকে। সজল কিছুক্ষণ চুপ থেকে তার মুখমণ্ডলটি দুহাত দিয়ে মুছে উঠে বসল। ততক্ষণে দেখল রনি গভীর ঘুমে নিথর হয়ে পড়েছে। আশা আর হতাশার দুই পাহাড়ের উপত্যকায় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার স্বপ্ন। লক্ষ্য অনেক উপরে। পাহাড়ের দীর্ঘ চূড়ায়। তার দুটি চোখের মনি ঢেকে রেখেছে দুটি দুর্বল পাপড়ি। মলিন হয়ে আছে স্বপ্নময়ী চোখ দুটোর নিচ। সজল অনেক ভাবুক ও কর্মঠ ছেলে। কোন কাজে সহজে হাল ছাড়ে না। কারোর কোন কটু কথায় সহজে রাগ করে না। কেউ কিছু বললে হাসি দিয়ে তার সাথে ভাল ব্যবহার করা চেষ্টা করে। অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হয়। অন্যের কষ্টে কষ্ট পায়। কাউকে বিপথে ও বিপদে দেখলে উদ্ধার করার চূড়ান্ত চেষ্টায় লেগে পড়ে।

সজল আস্তে আস্তে পা ফেলে ওয়াশ রুমে যায়। অজু করে রুমে আসে। রুমের ভেতরে আরেকজন ফজর নামাজ পড়ে- নাম তার নয়ন। নয়ন আগে থেকে সজলের পরিচিত। প্রতিদিন সজল ডেকে দিলে নয়নও আস্তে আস্তে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে আসে। কিন্তু আজ নয়নকে অনেক ধাক্কাধাক্কি ও ডাকাডাকির পরও উঠানো যাচেছনা। ঘুম থেকে বলছে পরে নামাজ পড়ে নিবে। একটু আগে মাত্র সে ঘুমিয়েছে। এখন সে উঠতে পারবেনা। ইত্যাদি।
সজল এবার মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। মনে মনে ভাবছে বিষয়টা নিয়ে। কী করে সম্ভব! সজাগ হওয়ার পরও নামাজ পড়বে না? এতবার ডেকে দেয়ার পরও সে উঠল না? আবার বলছে পরে পড়ে নিবে। মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হল নামাজ। যে নামাজ কায়েম করল সে দ্বীনকে কায়েম করল আর যে নামাজ পরিত্যাগ করল সে দ্বীনকে ধ্বংস

করল। রাসূলের সর্বশেষ অসিয়ত ছিল নামাজকে সংরক্ষণ করা। এসব হাদিস তো নয়ন খুব ভাল করেই জানে। তার কাছে জামাতে নামাজ পড়াটা কিছুদিন আগেই তো কত গুরুত্ব ছিল। সে প্রতিদিন তার নির্দিষ্ট নোটবুকে নামাজ কত ওয়াক্ত জামাতে হয়েছে কত ওয়াক্ত ছুটে গিয়েছে, কোরান কত আয়াত পড়েছে, হাদীস কতটি পড়েছে এসব কিছু সযত্নে লিখে রাখত। কিন্তু আজ কী হল তার?

ফজরের নামাজ শেষ করে সজল মসজিদে বসে পকেট থেকে স্মার্ট ফোনটা বের করে অর্থ সহ আধ ঘন্টার মত কোরান পড়ে। তারপর রুমে এসে শুয়ে পড়ে। ক্লান্ত শরীরটা বিছানার উপর রাখতেই দুচোখ বেয়ে নিদ্রার ফোয়ারা বয়ে গেল। শান্তি আর শ্রান্তিতে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় সজল।

রাতটি পোহালেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম ক্লাসের মুখোমুখি হবে রনি। আজ রাতে গত রাতের চেয়ে একটু আগেই ঘুমাতে পেরেছে সে। ঘুম থেকে উঠেই গোসল শেষে ভালভাবে সেজে গুজে নয়টার ক্লাস তথা প্রথম ক্লাসে এটেন্ড করবে। এসব চিন্তা নিয়েই গত রাতের ঘুম শুরু হয়েছিল। কোন সময় যে ঘুমিয়ে পড়েছে সেটা বুঝার আগেই হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজে রনির কান সজাগ হয়ে গেল। জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে তিনচারজন বড় ভাই রুমে ঢুকে বলতে লাগল, এই তোরা এখনও শুয়ে আছিস কেন? বড় ভাইয়েরা রুমে ঢুকতেই কাথা কম্বল রেখে অর্ধ নগ্ন দেহটা নিয়ে সবাই হুটহাট করে হ্যান্ডশেইক করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এবার রনির শরীরেও ক্ষিপ্রতা চলে এসেছে। সেও এক অবচেতন শক্তিতে চট করে কাঁথাটা ছুড়ে ফেলে সবার আগে হাত দিয়ে বড় ভাইদের সাথে হ্যান্ডশেইক করে। তারপর বড় ভাইয়েরা বলছে,

- তোরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে গেস্ট রুমে আয়। প্রোগ্রাম আছে। যা কথা তাই কাজ । কেউ কারোর দিকে না তাকিয়েই দ্রুত পেন্ট শার্ট পড়ে রেডি হচ্ছে। রনি তাকিয়ে আছে ঘরির দিকে। আটটা বাজে তিরিশি মিনিট। আর মাত্র আধ ঘন্টা বাকি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম ক্ষণটির জন্য। নিরুপায় হরিণীর মত ফেল ফেল করে তাকিয়ে আছে রনি। বড় ভাইদেরকে কি যেন বলবে রনি- ভাই আমার ক্লাস আছে নয়টায়; আজই প্রথম ক্লাস। কিন্তু নাহ কথাটি রনি মনের ভিতরই লুকিয়ে রেখেছিল; প্রকাশ করতে পারেনি। কোন দিনও পারে নি। কারণ গতকাল রাতের গেস্ট রুমে রনি এক বড় ভাই এর বয়ান সূত্রে শুনেছিল- ফার্সট ইয়ার কোন পড়া শোনা নেই, ক্লাস নেই, শুধু ঘুরে ঘুরে শেখা। - আরে আমরাতো প্রথম একমাস ক্লাসই যাইনি। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বয়ানের বাস্তবতা এতই নিষ্ঠুর সেটা রনি শুধু চোখেই দেখেনি বরং মন থেকে কতটুকু ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল তা সময়মত বুঝা গিয়েছিল।

দল বেঁধে সবাই ছুটছে গেস্ট রুমের দিকে। রনি সবার পিছনে নয় আবার একেবারে সামনেও নয় । তবে সামনের দিকে ক্রমশঃ তার অগ্রগতি হচ্ছে। গেস্ট রুমে ঢুকতে ঢুকতে সবার আগে রনির পা দুটোই পড়েছে। চলার ক্ষিপ্রতা ক্রমে বেড়েই চলছে। গেস্ট রুমে ঢুকার পরেই একটু থমকে দাঁড়াল। নিজের কাছে নিজেকে একটু অবেচেতন মনে হচ্ছিল। ক্ষিপ্রতার কমিয়ে মাথাটা নিচু করে গেস্ট রুমের এক কোণায় গিয়ে বসল রনি। দলে দলে বিভিন্ন রুম থেকে বিভিন্ন ইয়ারের ছেলেরা আসছে। পুরো গেস্ট রুম ভর্তি ছাত্র। রনি ভাবছে সবার কি একটু পর ক্লাস আছে? নাকি আমার একাই। কেন? কারোর মধ্যে তো কোন অস্থিরতার ছাপ দেখছিনা। এসব ভাবছে আর দেয়ালে সাটানো ঘড়িটার দিকে নজর দিচ্ছে। ঘড়ির কাঁটার টিক টিক আওয়াজ এর সাথে রনির চোখের পাতা দুটোও উপর

নিচ হচ্ছে। ঘড়ির কাটাটি বহন করছে সময় আর চোখের পাতা দুটো বহন করছে স্রোত; এই স্রোতের কাছে মহাসমুদ্রের স্রোতও হার মানবে। এই স্রোতের জল পৃথিবীর সমস্ত মিষ্ট নদী-নালার পানিকে লোনা করে দিতে সক্ষম।

ক্লাসে ঢুকে এক পাশে বসে আছে রনি। সবাই নতুন, ভয় নেই। আর কোন ধরণের দ্বিধাও কাজ করছেনা যেমনটা হয়েছিল রনির কলেজ জীবনের প্রথম দিন । কারণ, এই দুই তিন দিনের হলের অভিজ্ঞতা রনিকে যথেষ্ট পরিপক্ক করে তুলেছে। কিন্তু মনের বিষণ্নতাটা কাটেনি এখনো । প্রথম দিনের ক্লাসে নিশ্চই রনির অনেক কিছুই মিস হয়ে গিয়েছে। যেগুলো অন্যান্য ছাত্ররা ইতিমধ্যে জেনেছে; এমন অনেক বিষয় তার ধারণার বাহিরে এখনও। নানান সংশয়ে তার আত্মবিশ্বাস উঠা নামা করছে। স্যার আসার পরও এসব ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছে না। মনযোগের অভাবে আজও অনেক কিছু তার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে।

রনি ঘুম থেকে উঠেই দেখে মাগরিবের আজান হচ্ছে নিচের মসজিদে। সারা রাত না ঘুমানো তারপর তিন-চারটি ক্লাস; ক্লান্তি আর অবসাদে অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েছে রনির শরীর। তাই একটানা দিনের বেলা পাঁচ ঘন্টা ঘুমিয়েও রনির ক্লান্তি দূর হচ্ছেনা। চোখ মেলে দেখে রুমে কেউ নেই। শুধু একজন। খেয়াল করে দেখল- সে তো সজল। চোখ মুছতে মুছেতে রনি উঠে বসল। সজলকে বলল, বাকিরা কোথায় ? রুমে একজনও নেই যে? সজল বলল, রুমের সবাই মিলে একসাথে বাহিরে ঘুরতে গেছে। তুই যাসনি? সজল বলল , না। তুই ঘুমিয়ে আছিস সবাই

ডাকছে কিন্তু তুই মনে হয় অনেক ক্লান্ত তাই টের পাসনি। তাই আমি তুরে একলা রেখে আর গেলাম না। সজলের উদ্দেশ্য ছিল তার জন্য এতবড় একটি সেক্রিফাইস করলে হয়ত তাকে যে কোন সময় কোন ভাল কাজ যেমন নামাজ বা এই ধরণের কাজের কথা বললে সে সহজেই শুনবে। কিন্তু এত বড় একটি সহমর্মিতা দেখানোর পরও রনিকে সজল যখন মাগরিবের নামাজে যাওয়ার কথা বলল তখন রনি উত্তর দেয়,

- দোস্ত, আমি কাল থেকে তোর সাথে নামাজে যাব, এখন ভাল লাগতেছে না,শরীরটা ব্যথা করতেছে খুব। সজল ভেতরে ভেতরে অনেকটা হতাশ হয়েছে বটে কিন্তু মুখে একটি সুন্দর হাসি দিয়ে মসজিদের দিকে হাটা ধরেছে।

রনির ভিতরটা কেমন যেন খালি খালি লাগছিল। এই কয়েকদিন তো সবার সাথে খুব হৈ হোল্লরের মধ্য দিয়ে কেটেছে কিন্তু আজ সবাই ওকে না নিয়েই চলে গেল। সে ঘুমিয়েছিল সত্যি তাই বলে সবাই এভাবে চলে যাবে? সাথে সাথে সে সজলকে নিয়ে ভাবছে, ছেলেটা আমার জন্য সবার সাথে গেল না? ক্লাসের স্মৃতিগুলোও ভেসে আসছে তার মাথায়। সবকিছু মিলিয়েই অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণের জন্য আবার নিজের মধ্যে সম্বিত নিয়ে এসে নতুন করে ভাবতে শুরু করল। গায়ের উপর কাঁথাটাকে একটানে সরিয়ে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করল। সবকিছুর মধ্য দিয়েই তাকে পড়াশোনা করতে হবে। রুমে চেয়ার টেবিল বসানোর প্রয়োজন বোধ করছে না রনি এখন । কারণ, ইতিমধ্যেই সে রিডিং রুম,পত্রিকা রুম, লাইব্রেরী সম্পর্কে জানতে পেরেছে। ওখানে বসেই পড়তে হবে। কিন্তু কখন? যাহোক, চিন্তাটা মাথার মধ্যেই বপন করে রাখল। রনি একটা ব্যাপার খেয়াল করেছে, এত কষ্টের মধ্যে যারা নানান জায়গায় নানান ভাবে পড়াশোনা করছে তারাতো রুমে টেবিল চেয়ারে বসে পড়ছেনা। তবে তারা একটি জিনিস খুব ভাল ভাবে করছে সেটা হল, পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম ফাঁকি দেয়, গেস্ট রুমে যায় না, মাঝে মাঝে এসবের জন্য ঝারি টারিও খায় বড় ভাইদের কাছে। কখনো হল থেকে

বের করে দেয়ারও হুমকি দেয় বড় ভাইয়েরা। কিন্তু তারা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। নিয়মিত ক্লাস করতে পারছে। রনির মনে ভয় যদি হল থেকে বের করে দেয় তখন কী করবে সে। ঢাকা শহরে মেসে থাকার কথা তার কল্পনাতেই আসে না। এখন শুধু খাওয়ার খরচ বাবাদ তাও বাড়ি ও দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয় এই দুই জায়গা থেকে মিলিয়ে দুই আড়াই হাজার টাকা ম্যানেজ করা যায়। একটা টিউশনিও হয়নি এতদিনে। শুনা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের টিউশনির অভাব নেই। কিন্তু এখন দেখা যায় ঘটনা সম্পূর্ণ উল্টা। গ্রামেই সবচেয়ে ভাল ছিল। রনি একবার ভাবল তাহলে কী করা যায়? প্রোগ্রাম ফাঁকি দিলে যদি হল থেকে বের করে দেয়, তাহলে তো পড়াশোনা কন্টিনিউ করাটাই মুশকিল হয়ে পড়বে। এখন তো মাঝে মাঝে ক্লাস মিস হয় তখন তো সোজা বাড়ি গিয়ে ক্ষেতে কাজ করতে হবে।

আগামীকাল ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের অনেক বড় প্রোগ্রাম। হলে হলে প্রস্তুতি চলছে সবার। আগামীকালের প্রোগ্রামকে নিয়ে কথা বলার জন্য রাতে গেস্ট রুমে সবাই বসে আছে। হলের সভাপতি এসে সবার খোঁজ খবর নিয়ে বলল, প্রথম বর্ষ থেকে কে ভাল শ্লোগান ধরতে পারবে? কেউ কোন কথা বলছে না;সাহস করে কেউ বলছে না যে আমি পারব। সভাপতি সাথে যুক্ত করলেন, যারা শ্লোগান দেয় তারা সবার আগে সিঙ্গেল রুম পায় । রনি আর বসে থাকতে পারল না, রুম পাইলে তো রনি আর গণরুমে থাকতে হবে না সকল দুঃখ দুর্দশার বুঝি লাঘব হবে এবার, নিজের মত করে সবকিছু গুছিয়ে নিবে। নানান স্বপ্নগুলো সামনে রেখে সে আস্তে আস্তে দাঁড়াল। বলল, ভাই আমি পারব। তাকে সামনে নিয়ে শ্লোগান ধরতে বলা হল। অত্যন্ত বজ্র কণ্ঠে একটি শ্লোগান দিল রনি। সভাপতি অনেক খুশি হয়ে বলল,

- এখন থেকে তুমি সবসময় সব মিছিলে শ্লোগান দিবে।

রনিও অনেকটা ভেতরে ভেতরে খুশি হল। যাক, সবার পরিচিত মুখ সে হতে পেরেছে। হলের পলিটিক্যাল সবার কাছেই এখন থেকে একনামে পরিচিত- শ্লোগান মাস্টার রনি। পলিটিক্যাল মিছিল,মিটিং, সমাবেশ করার জন্য যেই তীক্ষ্ম ভাবভঙ্গি প্রয়োজন সবটাই রনির মধ্যে আছে। এসব সুনাম খ্যাতির কারণে সে চাইলেও এখন প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে ক্লাসে যেতে পারেনা। বিশেষ করে হলের সভাপতি যে কোন মিছিল প্রোগ্রামে সমাবেশে সরাসররি ফোন করে,খোঁজ খবর নেয়। তাই ইচ্ছা করলেই সে কোন মিটিং মিস দিতে পারে না। বড় ভাইদের খুব কাছের হয়ে গেছে রনি। তবে রনির মনে মনে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত আশাটি এখনো বিলুপ্ত হয়নি। আগে রুম নিতে হবে তারপর তাকে পড়াশোনা শুরু করতে হবে। স্বাভাবিক কারণেই রনি এখন গণরুমে সবার চেয়ে একটু বেশি আলাদা। প্রোগ্রামের সময় হলে সরাসরি সভাপতি ফোন দিয়ে বলে সবাইকে নিয়ে গেস্ট রুমে বা মধুর ক্যান্টিনে থাকার জন্য; যেটা বলার কথা ছিল ইমেডিয়েট সিনিয়র তথা সেকেন্ড ইয়ারের ভায়েরা। এই ব্যাপারে সুযোগ পেলে অনেক বড় ভাই বকা ঝকা করে রনিকে। ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে যাওয়া ভাল না। কিন্তু রনির দোষ কি? রনি তো বলে নি যে তাকে সভাপতি ফোন দিক। যাহোক, গণরুমে এখন কিছু হলে রনিই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। কোথাও ঘুরতে গেলে রনির সিদ্ধান্তের প্রতিই সবার একটু বেশি শদ্ধা জানাতে হয়। আগের চেয়ে কর্তৃত্ব ভাবটা অনেক বেড়ে গেছে যেটা একসময় ছিল শূন্যের কোটায়। একদিন কী নিয়ে যেন ছোট একটি তর্কবিতর্ক হচ্ছিল দুজনের মধ্যে,তন্মধ্যে রনিও ছিল। হঠাৎ কিছু বুঝে উঠার আগে চটে গিয়ে মারতে গিয়েছিল রনি। পরে সবাই বুঝিয়ে শুনিয়ে থামিয়ে রেখেছিল তাকে। রুমে মধ্যে সবচেয়ে বেশি জোর গলায় এখন রনিই কথা বলে। যে কোন কিছুতে রনির চিল্লা চিল্লিতে রুম গরম থাকে।

ঐদিন সজল আর নয়ন দুজনে বসে কথা বলছে লেকের পাড়ে। সজল বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান বিষয় নিয়ে চিন্তা করে পড়াশোনার পাশাপাশি। সে সবসময় নয়নকে চোখে চোখে রাখতে চায়। নয়নও চায় সজলের সাথে সঙ্গ দিতে। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে খুব বেশি একটা সময় দিতে পারে না। যদিও সজল ও নয়ন দুজনে একই ইয়ারে পড়ে তারপরেও সজলের সাথে নয়ন যথেষ্ট শ্রদ্ধার সাথে কথা বার্তা বলে। সেদিন কথা বলতে গিয়ে এক পর্যায়ে সজল বলছিল, কী দরকার এই সামান্য দু তিন বছরের সময়টাকে একটু বেশি আমোদ প্রমোদে কাটানোর জন্য পুর্বের ১২ বছরের সুন্দর পবিত্র জীবন আদর্শকে পরিত্যাগ করা। কী দরকার নামাজ ছেড়ে দেয়া? কী দরকার কোরান তেলাওয়াত বাদ দেয়া। হাদীস পড়তে সমস্যা কোথায়? ইসলামী সাহিত্য পড়ে মনটাকে চাঙ্গা রাখলে তো নিজেরই ভাল? এসব প্রশ্নের বিপরীতে নয়নের নয়ন যুগলে অশ্রুর বন্যা বইতে শুরু করল। হয়ত সে তার আগের জীবনের কথা স্মরণ করছে। এই এক-দেড় মাসের ছন্নছাড়া জীবন আর পূর্বের পূত-পবিত্র জীবনটির মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশের সূর্যটি লুকাতে শুরু করল দৃষ্টির সীমা থেকে। চারদিকে অন্ধকার ধেয়ে আসছে। ভারী হয়ে যাচ্ছে মানুষের কথাগুলো। লেকের পানিতে বন্দী সোনালী মাছগুলো যেন ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ছে। মাগরিবের আজান হচ্ছে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে। সজলের দৃষ্টি তার আরেক বন্ধু আশরাফ এর দিকে। মাথা নিচু করে মোবাইল টিপছে ঘন্টা খানেক হল। আজানের আওয়াজ শুনার পর সে তার সম্বিত ফিরে পেয়েছে। সজল কাছে গিয়ে বলল, দোস্ত চল নামাজটা পড়ে আসি, অনেক্ষণ যাবৎ এভাবে বসে থাকাতে তোর ঘাড় মোড় ভেঙ্গে আসছে মনে হয়। নামাজটা পড়লে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। অনেক্ষণ যাবৎ আশরাফ যে অবস্থায় ছিল, এই দৃশ্য পৃথিবীর কোন জড়-জীবের চোখে পড়েনি ঠিকই কিন্তু সজলের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। বাঁজ পাখির মত চোখে চোখে রেখেছে। হলের সবাই সজলের টার্গেট বিশেষ করে তার সকল বন্ধু, তারপর

রুমমেটরা, তারপর কাছের কয়েকজন বন্ধু। সুযোগ মত সবাইকেই তার আচরণ দিয়ে মুগ্ধ করে সজল। আশরাফ আমতা আমতা করে কী যেন বলতে চাচিছল -আমার পেন্টটা ভাল না। কিন্তু মুখ দিয়ে স্পষ্ট করে আর বের হলো না। বরং এক চৌম্বক আকর্ষণে আশরাফ সজল ও নয়নের সাথে মসজিদের দিকে ছুটল।

.

গ্রাম থেকে পড়াশোনা করা রনি দেশের রাজনীতি সম্পর্কে দুচার লাইন বইয়ের পাতাতেই যা পড়েছে। এ সম্পের্কে কোন দিনই কারোর কাছে সুস্পষ্ট কিছু শুনেনি। শুনার প্রয়োজনও তার ছিল না। অজপাড়া গায়ে থেকে রাজনীতির খবর রাখতে হলে চা স্টলে নিয়মিত সময় দিতে হয়। যেই সুযোগ রনির কখনোই হয়নি। চা স্টলের টিভিকে সামনে রেখে চায়ের কাপে চুমোক দিয়ে যে পরিমাণ রাজনীতি চর্চা এই দেশে হয় সেটা গোটা পৃথিবীর রাজনীতি চর্চার সিংহভাগ বললেও অত্যুক্তি হবে না। তবে রনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে গেস্ট রুমের নসিহত অনুযায়ী একজন বিশ্বকাঁপানো রাজনীতিবিদের আত্মজীবনী পড়েছিল আর ডিপার্টমেন্টের এক স্যারের নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক একটি বই পড়েছে; বইটি লিখেছেন জাহানারা ইমাম ‘একাত্তরের দিনগুলি’ এই শিরোনামে। শুনা যায় এই স্যার নাকি আল্লাহ খোদা কিছুই বিশ্বাস করে না। জান্নাত জাহান্নামকে নাকি তামাশা মনে হয়। ফেরেস্তা শয়তান এসব নাকি স্যারের কাছে রূপকথার গল্পের মত লাগে। আর এসব কিছু যে আছে এই বিশ্বাস সবটাই কেবল রনি জন্মসূত্রে সামাজিক পরিবেশে জেনে আসার কারণে। কোন কিতাবে এসব বর্ণনা আছে, কোন কিতাবে এসব পাওয়া যায় কোন কিছুই রনি কোন দিন পড়া বা জানার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। যাহোক, স্যারের বিশ্বাস নিয়ে স্যার থাকুক আমার বিশ্বাস নিয়ে আমি থাকি । ধর্ম নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা ঠিক না এই কথাটা ভাল করেই রনির মনে বদ্ধমূল ছিল। তাই স্যারের ব্যাপার নিয়ে সে মাথা

না ঘামিয়ে স্যারের নির্দেশনা দেয়া বইটা কোন এক সুযোগে সে পড়েছে। অনেক ভালই লেগেছে তার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, দেশের রাজনীতি, দেশদ্রোহী ইত্যাদি বিষয়ে প্রথম ধারণা পেয়েছে রনি। এসব বিষয়ে এখন আর রনির জ্ঞান শূন্যের কোটায় নেই। দুটি বই পড়ার পর অনেক কিছুর ব্যাপারেই ধারণা পেয়েছে। গ্রামে থাকতে রনি হুজুরদেরকে অনেক সম্মানের চোখে দেখত। কিন্তু নাস্তিক ঐ স্যারের নির্দেশনায় আরো দু একটি বই পড়ার পর এখন হুজুর দেখলে কেমন যেন রাজাকার রাজাকার মনে হয়। দেশ বিরোধী মনে হয় কোন দাড়ি টুপি ওয়ালা লোক দেখলে।

.

ইদানীং সজল এর সাথে বেশ একটা দেখা হয় না রনির। বিভিন্ন হল মিলিয়ে কিছু পলিটিক্যাল বন্ধু ইতিমধ্যে তার হয়ে গেছে। রুমের বাহিরে ওদের সাথেই বেশি সময় কাটে। আর সজল ও খুব বেশি একটা রুমে থাকে না। দিনের বেশির ভাগ সময়ই ক্লাস আর লাইব্রেরিতে পার করে। ঐ দিন হলের পাশের রাস্তায় সজল দাঁড়িয়ে আছে অপরদিক দিয়ে রনি তার চার পাঁচজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে আসছে। সবার হাতেই সিগারেট সাথে নয়নও আছে। সজল ভাবছে সবার হাতে সিগারেট থাকলেও নয়ন আর রনির মত ভাল ছেলে সিগারেট মুখে দিতে পারে না। কিন্তু কাছে আসার পর দেখা গেল ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সজল একবার ভাবছে নয়নের কথা আরেকবার ভাবছে রনির কথা। কাউকেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। এই কয়দিন হল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসল! আড়াই তিন মাস সময়ের ভিতরে এত কিছু হয়ে যাচ্ছে? সজলের সামনে আসতেই নয়ন কিছুটা হতবম্ভ হয়ে গেল, নিজেকে লোকানোর চেষ্টা করছে। হাতটা পিছনে নিয়ে বলল, দোস্ত কেমন আছিস? কি করিস এখানে? ইত্যাদি ইত্যাদি। আর রনিও যথেষ্ট সংকোচ বোধ করছে। সজল তো তাদের ফ্রেন্ডেই কিন্তু তার সামনে কেন যেন কোন অপরাধ সানন্দে করে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। একটা সম্মান কাজ করে তার প্রতি। সাথে থাকা বন্ধুরা

কিছুক্ষণ পর জানতে চায় সে কি বড় ভাই নাকি? তার সামনে এমন কাচুমাচু করছিস কেন? রনি আর নয়নের মুখে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের কথামালা ছাড়া অন্য কোন উত্তর নেই। বন্ধুদের প্রশ্নের চর্বিত চর্বণের ফলে বিষয়টি দুজনের কাছে বিরক্তিতে রূপ নিয়েছে। রনির মনের ভিতর একটা ব্যাপার কাজ করা শুরু করেছে ইতিমধ্যে, সে আমাদের ইয়ার মেট। তাকে অতিরিক্ত সম্মান দেখানোর কী আছে? সে কে? বিরক্তিকর! মাগরিবের আজান হচ্ছে। হল গেইটে দাঁড়িয়ে আছে সজল; উদ্দেশ্য নয়নকে নিয়ে মসজিদে একসাথে নামাজ পড়বে। পাশেই একটি গাছের গোড়ায় বসে ওরা আড্ডা দিচ্ছে। আজান হয়ে গেল কিন্তু নয়ন কোন ভ্রুক্ষেপ করছে না। হয়ত মনে মনে ভাবছে তার এখন আড্ডা বাদ দিয়ে নামাজে যাওয়া উচিত কিন্তু আড্ডা আর বন্ধুদের ভালবাসার বন্ধন তাকে আলাদা হতে দিচ্ছেনা। হল গেইটে দাঁড়িয়েই নয়নের মোবাইলে ফোন করে সজল; আবার একটু স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য। তবে এই স্মরণ নয়নের মনে বিরক্তি ছাড়া আর কোন কিছুই বৃদ্ধি করেনি। কিন্তু সজলের কাজ তো কেবল স্মরণ করিয়েই দেয়া; এর চেয়ে বেশি নয়। বাকিটা উপরওয়ালা দেখবেন। অনেকটা বিষন্ন মন নিয়েই সজল মসজিদের দিকে পা বাড়াল। আর মনে মনে তাদের জন্য সঠিক পথের দোয়া করল।

.

কাল থেকে মিডটার্ম শুরু। পরীক্ষার আগের একসপ্তাহে রনির পড়াশোনা জীবনে কোন দিন কারোর সাথে পড়াশোনা ব্যতিত অন্য কোন কাজ তো দূরে থাক কোন কথা-বার্তাও বলেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার পদ্ধতী পরীক্ষা আসার পর ছাত্র-ছাত্রীদের যেন পুরো পাঁচটি বছর শুধু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়। এত পরীক্ষা আর এত প্যারা! গেস্ট রুমে পলিটিক্যাল আড্ডা দেয়ার সময় কয়েকদিন আগে এক বড় ভাই বলছিলেন, মিডটার্ম কোন পরীক্ষা না, পরীক্ষার আগে দুই আড়াই ঘন্টা পড়লেই হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও যদি সারাদিন পড়তে হয় তাহলে

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার কী আর মানে রইল। বিশ্ববিদ্যালয় তো ঘুরে ঘুরে শিখার জায়গা। এখানে বই খাতা আর কলম নিয়ে পরে থাকলে বেশি দূর আগানো যায় না। এক সময়ের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ এশিয়ার প্রভাবশালী বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন বিশ্ব রেংকিং এ একহাজারেরও মধ্যেও নেই। যেখানে পাকিস্তান, ভারত, সিংগাপুর, মালয়শিয়া, তুরস্ক, সৌদিআরব সহ অনেক দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ কেন এত পেছনে? ওদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে রনির চেয়েও বেশি মেধাবী ছাত্ররা পড়াশোনা করে? জীবন যুদ্ধের সাথে লড়াই করে গড়ে উঠা রনির মত দিন রাত রাজনীতির মিছিলে শ্লোগান কি সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দেয় না? আমাদের দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কপালেও এই সৌভাগ্য অর্জন হয় না কেন? কেন হয় না তিন মাস বয়সী একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন আবেগী রনির কাছে এই প্রশ্নের উত্তর সাথে সাথে না মিললেও সময়মত বুঝে নিয়েছিল সে। শ্লোগান মাস্টার রনি হাজারও প্রোগ্রাম, আড্ডা আর ব্যস্ততা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম পরীক্ষাকে এভাবে হেলে ফেলে ছেড়ে দেয়ার লোক নয়। এক সপ্তাহ না হোক অন্তত দুই দিন আগে হলেও পড়াশোনা শুরু করা উচিত হবে তার। কিন্তু পরীক্ষা তো কাল;মাত্র একদিন বাকি আছে।

সহরোয়ার্দী উদ্যানে ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে মহাসমাবেশ শেষ করে রনি হলের দিকে ফিরছিল আর এসব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল তার মাথায়। যাহোক, গতকালটাকে তো আর আজকের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। কী পড়িয়েছে আর কী আসবে কেমন হবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র? এই কয়দিন তার অনেক ক্লাস মিস হয়েছে। আচ্ছা, ফ্রেন্ডের রুমে গিয়ে জেনে নিবে সবকিছু। ডিপার্টমেন্টের বন্ধুদের মধ্য থেকে যারা পলিটিক্স করে কারোর কথাই মনে পড়ছে না রনির। সজলের কথাই আজ খুব বেশি মনে হচ্ছে। সজলকে ফোন দিয়েও পাওয়া যাচ্ছিল না। ফোন বন্ধ রেখে এক মনে সে পড়ছে। দিশেহারা ভাবটা বেড়ে অনেকটা উর্ধ্বমুখি হয়ে এখন ধীরে ধীরে

নিম্নমুখি হয়ে চলা শুরু করেছে। ধুর শালার পরীক্ষা! আল্লাহ যা কপালে রাখছে তাই হবে। এত বেশি কিছু ভাবার প্রয়োজন নেই। রনি জীবনে কোন পরীক্ষায় ফেইল করেনি। শুনেছে ডিপার্টমেন্টে অনেক স্টুডেন্ট ফেইল করে। ইয়ার ড্রপ দিয়ে পরের বছর একই ইয়ারে পড়ে। কিন্তু রনি তো ফেইল বা ইয়ার ড্রপ দেয়া এসব ভাবতেই পারেনা। সে তো সাময়িক সময়ের জন্য মিছিল মিটিং প্রোগ্রাম করছে, জাস্ট একটি রুম পাওয়ার জন্য। রুম পেয়ে গেলে তো সে ধুমছে পড়া শুরু করবে। তবে এতদিনের অভিজ্ঞতার দারা সে রাজনীতির শেষ সীমানাটা অনুধাবন করতে না পারলেও রাজনীতির মজাটা অনেকাংশে অনুধাবন করতে পেরেছে।
সজলের কাছ থেকে প্রশ্নপদ্ধতি, কোর্স ডিটেইল ও কিছু শিট নিয়ে যেগুলো আগামীকাল পরীক্ষার জন্য সহায়ক হবে- পড়া শুরু করল। এর মধ্যে পলিটিক্যাল এক বড় ভাই ফোন দিয়ে চায়ের দাওয়াত দিল। কাল পরীক্ষা কিছু পড়াশোনা হয়নি ইত্যাদি বলে কোনমতে বড় ভাইয়ের দাওয়াত থেকে রেহাই নিয়ে এবারের জন্য রনি আবার পড়তে শুরু করেছে। পড়তে পড়তে যখন পরীক্ষার আধ ঘন্টা বাকি তখন রনি বুঝতে পারল যে, তার পরীক্ষায় কোন ধরণের প্রশ্ন আসতে পারে কেমন করে উত্তর দিলে ভাল ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। তিন মাসের পড়া যে তিন ঘন্টায় শেষ করা যায় না সেটাও রনি বুঝতে পারল। পরীক্ষার হলে গিয়ে দীর্ঘ বার বছরের পড়াশোনা জীবনের স্মৃতিচারণ করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। এক সময় যে কোন বিষয়ে নিজের ব্যর্থতা দেখতে পেলে বা কোন জিনিস পাওয়ার ব্যাপারে রনি দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে পারত কিন্তু এখন কেন জানি যে কোন বিষয় সহজে মেনে নেয়া তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। সে নিজের মধ্যে একটি ব্যাপার মনে মনে খুব শক্তভাবে ধারণ করে নিয়েছে যে তাকে যে কোন পরিস্থিতি এডপ্ট (মানিয়ে নিতে) করে নিতে হবে। কিন্তু যে কোন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের বিশ্বাস ও শক্তিটা সে একদম হারিয়ে ফেলেছে বললেই চলে। রাতে দেরি করে ঘুমানো ঠিক না তারপরও সারা রাত সজাগ থাকা, সকালে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে

নাস্তার সময় পার করা, কোন দিন সিগারেট মুখে না দেয়া নিষ্পাপ ছেলেটার বন্ধুদের সাথে আড্ডার ছলে একটানা কয়েকটা সিগারেট শেষ করা, পরীক্ষার এক ঘন্টা আগে পড়ে পরীক্ষার হলে যাওয়া, ক্লাস মিস করে পলিটিক্যাল প্রোগ্রামে শ্লোগান দেয়া সবকিছুই 'মানিয়ে নেয়া' সূত্রের আলোকে রনি নির্দ্বিধায় মেনে নিচ্ছে।

পরীক্ষার হল থেকে বের হওয়ার পরপরই রনির বড় ভাই ফোন দিয়েছে। সম্ভবত সে তার আদরের ছোট ভাইটির পরীক্ষা কেমন হয়েছে এই খবরটির জন্য অধীর আগ্রহে বসে আছে। যেমনি বারটি বছর ধরে তার পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর খবর নিয়েছে। আর কোন দিনই রনির মুখ থেকে পরীক্ষা খারাপ হওয়ার সংবাদ শুনেনি। আজও শুনবেনা এটাই প্রত্যাশা। প্রতিবারের মত এবারও রনি কোন খারাপ সংবাদ দেয়নি। যেহেতু ভাল সংবাদ দেওয়াই রনির দীর্ঘ বার বছরের অভ্যাস। ফোনটা কেটে দেয়ার পর তার মাথাটা চক্কর দিল যেন সে বেশি দূর আর এগুতে পারবেনা। সেমিনার রুমে গিয়ে মাথাটা টেবেলের উপরে রেখে খানিক সময় নিশ্চুপ হয়ে রইল সে। প্রতিজ্ঞার রক্তকণিকা গুলো উপরের দিকে ধেয়ে আসছিল ক্রমশ। যে করেই হোক তাকে এই অবস্থা থেকে উত্তরণ হতে হবে এমন একটি ভাব নিয়ে তার শিরা উপশিরা সমূহ একটি আন্দোলনের হাক-ডাক দিয়ে শরীরে একধরণের চেতন তৈরি করতে যাচ্ছিল ঠিক এ সময় একটি ফোন কল তার চেতনার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিতে সমর্থ হল। পরক্ষণে সে বুঝতে পারল যে, ক্ষণিক সময় হঠাৎ যে একটি চেতনা তৈরি হতে যাচ্ছিল সেটি ছিল অবচেতন নিছক স্বপ্ন, শরীরটা ঝারা দিয়ে সবকিছু ভুলে গিয়ে ঝরের গতিতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। ফোনকল অনুযায়ী ক্ষিপ্র গতিতে ছুটল মধুর ক্যান্টিনের দিকে রনি।

এতদিনে রনির চেহারার গ্রাম্যভাব অনেকটা কেটে গিয়েছে। নানা ধরণ আর নানা অঞ্চলের বন্ধু-বান্ধবের সাথে চলাফেরার কারণে তার কথাবার্তায়ও যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে, পোষাক পরিচ্ছেদেও স্মার্টনেসের আলোকরশ্মি দেখা দিতে শুরু করেছে। বিশেষ করে গেস্ট রুমে পলিটিক্যাল আড্ডার সময় একদিন ম্যানার শিখাচ্ছিলেন, তখন রনিকে নেত্রকোণার এক বড় ভাই রনিকে তার কথাবার্তায় গ্রাম্য উচ্চারণের উপস্থিতি টের পেয়ে শাসিয়ে বলছিলেন, এই ধইঞ্চা ছেরা! ঢাবিতে পড়স, সূর্যসেন হলে থাকস, দুই মাস হয়ে গেল কিন্তু এখনও কথাবার্তায় স্মার্টনেস আনতে পারস নাই? যদি আর কোন দিন এমন কইরা কথা কস তাইলে লাইথাইয়া চেটকায়ালবাম! বুঝছস! ঐ দিনের পর থেকে রনি ভাল করেই বুঝে নিয়েছিল কিভাবে কথাবার্তায় স্মার্টনেস দেখাতে হয় এবং নিজের মধ্যে একটা প্রত্যয় তৈরি হয়েছিল ঐদিন- যে করেই হোক তাকে কথাবার্তায় গ্রাম্য উচ্চারণ বাদ দিতে হবে।

পরীক্ষার পর রুমে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়ার কথা । যে প্রশ্নগুলো ভালভাবে উত্তর দিতে পারেনি সেগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করা যার পরীক্ষা পরবর্তী প্রথম কাজ ছিল, সে পরীক্ষার হল হল থেকে বের হতে না হতেই বড় ভাইয়ের ফোন কলে মধুর ক্যান্টিনে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে হ্যান্ডশেইক করে পরীক্ষার ক্লান্তি দূর করে। সন্ধা ঘনিয়ে আসছে। প্রায় দু ঘন্টা যাবৎ মধুর ক্যান্টিনে দাঁড়িয়ে ছিল হলের সভাপতি হোসেন ভাইয়ের পেছনে। কত জন আসে যায়। হোসেন ভাইও এই চেয়ার থেকে সেই চেয়ারে যায়। এই নেতার সাথে কথা বলে সেই নেতার সাথে কথা বলে। রনিও পিছু পিছু তার অনুসরণ করে চলছে। এখানে যে রনি একাই আছে তা কিন্তু নয় হলের প্রথম বর্ষের ৫০ জন ছাত্র সহ প্রায় নব্বই থেকে একশ জন মধুর ক্যান্টিনের ভিতর-বাহিরে ঘুর ঘুর করছিল। তবে রনির মত একনিষ্ঠ ভাবে হয়ত সবাই এখানে সময় দিচ্ছেনা। আসলে যে কোন

কাজ করার সময় রনি সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সাথে করার চেষ্টা করে; যেটি তার চেহারায় সহজেই ফুটে উঠে।

নড়বড়ে শরীরটা নিয়ে হেলিয়ে দুলিয়ে হল গেটে যেতে যেতেই সেন্সলেসের মত হয়ে গেছে রনি। মুখটা শুকিয়ে কাঠপ্রায়। এই অবস্থায় কোনক্রমে রুমে গিয়ে শরীরটাকে সপে দেয় বিছানার সাথে। মাগরিবের নামাজ সম্পন্ন করে সজল আসে রুমের ভিতর। পরীক্ষার পরে সজল ও ফোন কল পেয়েছিল মধুর ক্যান্টিনে যাওয়ার জন্য কিন্তু সে ওখানে কিছু সময় থাকার পর যথাসময়ে সুযোগ বুঝে রুমে এসে বিশ্রাম নেয়। সজল অপেক্ষায় ছিল কখন রনি আসবে। তার সাথে পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনা করবে। কিন্তু রুমে এসেই রনিকে নিথর নিস্তব্ধ ও ঘুমন্ত পেল। একটি মশা বসে আছে তার ধূলিমাখা মলিন একটি গণ্ডের উপর। একটানে ইচ্ছামত পেট ভরে রক্ত পান করে ধীরে ধীরে মশাটি তার কর্ণের উপর লুটিয়ে পড়ে। নিথর নিস্তব্ধ অসহায় সময়ের সুযোগ একটি ছারপোকাও ছাড়তে চায়না। ছারপোকাদের সেন্স মানুষের মত সয়ংক্রিয়। মানুষের রক্তের মধ্যে যার একমাত্র জীবিকা তার সেন্স মানুষের মত হবে এটাই যৌক্তিক। এই রক্তহীন সাদা ছারপোকাটিও তার ঘাড়ের মধ্যে স্বাধীন রাজত্ব কায়েম করে ক্রমেই লাল হয়ে উঠছে।

.

দুদিন যাবৎ নয়ন নেই হলে। তার বাবা এলাকার একটি মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল। রাজনীতি করত ছাত্রজীবন থেকে। এখনও রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। কোন এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেদিন তার বাবাকে সাদা পোশাকদারী কয়জন পুলিশ বাড়ি তল্লাশি করে জেলে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে অস্থির মন নিয়ে নয়ন বাড়ি যায়। তার মা অনেক ধৈর্যশীলা ও সাহসী মহিলা। নয়ন পরিবারের বড় সন্তান। ছোট আরো তিন ভাই বোন আছে। ওরা তেমন মেচিউরড হয়নি। নয়ন বাড়ি যাওয়ার পর তার

ছোট ভাই বোনদের অবুঝ অসহায় খরগোশের মত চাহনি দেখে তার মনে একটি ক্ষোভ তৈরি হল। ক্ষোভের মাত্রা কখনো বেশি হয়ে গেলে জীবনে বড় বড় সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যায়। এই ক্ষোভ মানসিক অবস্থাকে প্রায়ই সঠিক দিকে ধাবিত হতে দেয় না। তার মায়ের মুখোমুখি হতেই তার মা একটি মুচকি হাসি দিয়ে তার খোঁজ খবর নিল। কেমন হচ্ছে তার পড়াশোনা? হলে থাকতে কোন সমস্যা হচ্ছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। তার স্বামী যে কারাগারে বন্দী, চেহারা দেখে বুঝার কোন উপায় নেই। কারাগারে তার বাবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার পর নয়ন ঘরে এসে দীর্ঘক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। এই অসহায় পরিরবারটিকে সে কিভাবে একলা রেখে চলে যাবে? এদিক দিয়ে তার ক্লাস হচ্ছে। হলে পলিটিক্যাল প্রোগ্রামের কারণে কতগুলো ক্লাস মিস হয়ে গেল তার! এখন আবার এই কাহিনী ঘরে! এই ছোট ছোট ভাই-বোনদের দেখা শোনার দায়িত্ব কী তার নাকি তার বাবার? তার মাথায় বারবার ঘুরপাক খাচ্ছিল কেন তার বাবা এই খারাপ সময়ে এসব রাজনীতি ফাজনীতি করতে গেল? ভাল সময় তো একসময় আসবে। যখন সময় ভাল ছিল তখন তো ভাল করেই করতে পেরেছে। ওনার কলিগ সেও তো একসময় এই রাজনীতি করত। কই, এখন তো সে করে না। তার দিনকাল কি যাচ্ছে না? তার কি পরিপূর্ণ ধর্ম কর্ম পালন হচ্ছে না? নয়নের ক্ষোভ নয়নকে যেখানে নিয়ে যাওয়ার কথা সেখানে না নিয়ে তাকে নিয়ে উল্টা পথে রওয়ানা হচ্ছিল। চট করে বসা থেকে উঠে সে কাপড় চোপড় রেডি করে ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে সোজা রাস্তার দিকে হাটা ধরল। মায়ের কাছ থেকে সেদিন ভাল করে বিদায় নেয়ারও সুযোগ হয়নি। নয়নের মা সেদিন তার রাগের ত্বরণ ও স্বরণ কিছুই অনুমান করতে পারেনি।

সজল ফজর সালাত আদায় করে রুমে ঢুকতেই পিছন দিক থেকে খেয়াল করল নয়ন আসছে; তার কাঁধে একটি ব্যাগ। এলোমেলো চুল। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি তার চোখ মুখে অবলোকন করা যাচেছ। মনটা বেশি

একটি ফুরফুরে নেই। বাবা মাকে বিদায় জানিয়ে বাড়ি থেকে আসার সাথে সাথে কারোর মনই তেমন ভাল থাকে না। আস্তে আস্তে বাড়ির মায়া কাটে। বিশেষ করে যাদের প্রথম বাড়ির বাহিরে থাকার অভিজ্ঞতা, তাদের তো বাড়ি থেকে আসার পর রীতিমত কয়েকদিন কান্না করতে হয়। পিছন ফিরে সজল তাকে ভাল মন্দ জিজ্ঞাস করল। বাড়ির সবাই কেমন আছেন, তার আব্বু আম্মু কেমন আছেন ইত্যাদি। কিন্তু নয়নের উত্তর গুলো কেমন যেন একটু অস্বাভিক মনে হচ্ছিল। মাত্র বাড়ি থেকে এসেছে ছেলেটা, এসময় এত বিস্তারিত জেরা করতে গেলে হিতে বিপরীত কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনায় কথা না বাড়িয়ে সজল চুপ করে রুমের ভিতরে চলে গেল। সজল কদিন ধরে একটা বিষয় খুব করে ভাবছে, ছেলে মেয়েরা বিগত বার বছর এক অবস্থায় থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার এক দেড় মাস পরেই এত পরিবর্তন হয় কী করে? তার মনে একটা সিদ্ধান্তও এসে ইদানীং ঘুরা ফেরা করছে সেটি হল- মনে হয় ইতিবাচক মানসিকতার জন্য সর্বদা একটি ইতিবাচক পরিবেশে থাকতে হয়। ইতিবাচক পরিবেশ ছাড়া একটি মানুষের পক্ষে ইতিবাচক অবস্থানে থাকা অনেক কঠিন এমনকি অসম্ভবও বটে।

একটি সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক মারামারির খবর পাওয়া যেত। অস্ত্রের ঝনঝনানিতে মুখরিত ও আতঙ্কিত থাকত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। এই সময়ে এসে একটি ছাত্রের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি বহিস্কারের আইনটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসক খুব শক্ত হাতে নিয়েন্ত্রণ করায় মারামারি নাই বললেই চলে। যা হয় খবরের কাগজ পর্যন্ত গড়ায় না। সেদিন রনি তার বন্ধুদের সাথে টি.এস.সিতে চা খাচ্ছিল। হঠাৎ বাহির থেকে গণ্ডগোলের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। কান পাতার পর কিছু অস্বাভিকই মনে হচ্ছিল ওদের কাছে। দ্রুত বসা থেকে উঠে সামনে দেখল সূর্যসেন হলেরই কয়েকজন সেকেন্ড ইয়ারের বড় ভাই কাদের

সাথে যেন কথা কাটাকাটি করছে, হাতাহাতির পর্যায়। তারা ঘটনার কাছাকাছি যেতেই হাতাহাতি শুরু হয়ে গিয়েছে। গেস্ট রুমের পলিটিক্যাল আড্ডায় ওরা শুনেছিল হলের কোন ফ্রেন্ড বা বড় ভাই বিপদে পড়লে সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যে এক ধরণের স্বর্গীয় সুখ বিদ্যমান। এছাড়া বিপদে সহযোগিতা করার কথা রনি ও তার বন্ধুরা বই-কিতাবে কি কম পড়েছে? যাহা নীতি তাহাই কাজ। আচ্ছা মত নিজেদের পেশী শক্তি দিয়ে সহযোগিতার হাতকে তারা কাজে লাগাল। জীবন যুদ্ধে বিজয়ী লড়াকু সৈনিক রনি এমন সামান্য দু চারটাকে শায়েস্তা করে হাসপাতালে পাঠানো তার জন্য খুবই সাধারণ ব্যাপার।

দশ-বার জন ছেলের সহযোগিতার কবলে হাসপাতালগামী ছাত্রটি মুহসিন হলের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। প্রোক্টরিয়াল টিম এসে সরেজমিনে তথ্য নিয়ে সবার নাম না পাইলেও রনির নাম এক নম্বরে লিপিবদ্ধ করার যাবতীয় সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছে। অসহায় ও দুঃসময়ের সুযোগ তো কেহই হাতছাড়া করে না। মিডিয়া করবে কি করে? ‘ক্ষমতাসীন দলের পেটোয়া বাহিনীদের বেধরক মারধরে মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে মুহসিন হলের মেধাবী ছাত্র মেহেদী” ‘ক্ষমতাসীনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্ররা” সরকারী ছাত্রসংগঠনের ক্যাডারের হামলায় আহত ঢাবি শিক্ষার্থী” এভাবে প্রতিটি দৈনিক আর টিভি চ্যানেল যখন উক্ত নিউজ দিয়ে শিরোনাম করা শুরু করল, তখন বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে গড়িয়ে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের উপরমহল পর্যন্ত নাড়া দিয়েছে। রাজনীতিতে পাকা একজন নেতা বলছিলেন, ‘তিনি নাকি আল্লার পর সাংবাদিকদের ভয় পান।’ ঘটনার দ্বিতীয় দিন রনি কিছু বুঝার আগে তাকে হলের সভাপতির রুমে নিয়ে কয়েক দফা চর থাপ্পর দিয়ে দল থেকে বহিস্কার করেছে। হলে যেন কোন দিন আর সে না আসে। অনেক বলে কয়ে আজীবন বহিস্কার থেকে তাকে দুবছরের জন্য বহিস্কার মঞ্জুর করা হয়। তবে একটি স্বস্তির ব্যাপার হল,

বিষয়টি সরাসরি ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের কাঁধে চলে আসায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আর কিছু করে নি। শাস্তি বা অন্যান্য বিষয় সবটাই তাদের হাতে ছেড়ে দেয়। এতে করে রনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসকের সামনে গিয়ে আর বিষয়টি নিয়ে দাঁড়াতে হয়নি। ব্যাপারটির রহস্য হয়ত সেদিন এক বড় ভাই সান্ত্বনা আকারে ব্যাখ্যা করে না দিলে রনি ভাল করে বুঝতনা। তাই ঐদিন থেকে ক্ষমতাসীন সেই ছাত্রসংগঠনটির প্রতি তার নতুন করে মুহাব্বতও তৈরী হয়েছিল। কিন্তু রনিকে দল থেকে বহিস্কার করবে কেন? সে কি ঐ দলের কর্মী বা নেতা? সে যদি ঐ দলের লোক হত তাইলেই তো তাকে দল থেকে বহিস্কারের প্রশ্ন আসবে। রনি তো একটি সিট নিয়ে মনের মত পড়াশোনা করার ভাবনায় কয়েকদিনের জন্য প্রোগ্রাম, মিছিল, শ্লোগান দিচ্ছিল। স্বপ্নে বিভোর থাকা, আশায় বুক বেঁধে রাখা, অপেক্ষমাণ তার পরিবারের মুখে হাসি ফুটাবে এই প্রত্যাশায়ই তো কেবল সে এসব কিছু করছে। কিছুটা মনে মনে হাসিও পাচ্ছিল তার। পরের দিন আবার কয়েকটা জাতীয় পত্রিকায় খবর আসল, ‘সূর্যসেন হলের ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের এক কর্মী দুই বছরের জন্য বহিস্কার।” এক বন্ধু তাকে সেদিন বলছিল, দোস্তা তুই তো পুরাই হিরু হয়ে গেছিস রে! কয়দিন পরই পোস্ট দিব তুই ভাইটাল একটা পোস্ট পাবি। ইত্যাদি ইত্যাদি। বন্ধুর কথার মমার্থ রনি সেদিন কিছুই বুঝেনি।
এক সপ্তাহ ধরে রনি পাশের হল তথা মুহসিন হলে থাকে তার ডিপার্টমেন্টের এক বন্ধুর কাছে। সে মনে মনে কিছুটা কষ্ট পাচ্ছে, হলের সভাপতি তাকে দিয়ে কত কাজ করিয়েছেন! ক্লাস-পরীক্ষা সবকিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে কত মিছিলে-মিটিং এ অংশগ্রহণ করল! কিন্তু একটি বারের জন্যও তাকে ফোন দিয়ে খোঁজ নিচ্ছেনা। এই তো কয়দিন হল মাত্র, দশ পনের দিনও তো হয়নি সভাপতির জন্মদিন গেল প্রথম বর্ষের সকল ছাত্রদেরদের নিয়ে তার নেতৃত্বে পুরো হল কাঁপিয়ে কত জমকালোভাবেই না সে উদযাপন করেছিল। আজ মনে হচ্ছে কোন কিছুই কাজে আসল না। অবশ্য রনি যে কাজ করে মনের আনন্দ ও

আবেগ থেকেই করে এর পিছনে যত উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন। অন্য হলে তো আর সবসময় থাকা যাবে না। নিজের হলে আজ হোক কাল হোক আসতেই হবে। ফ্রেন্ড, ইমিডিয়েট বড় ভাই অনেকের সাথেই কথাবার্তা বলে সমাধান বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সবাই একটা কথাই বলে আপাতত এখানে কয়দিন থাক। আপাতত এভাবে কয়দিন থাকার কথা বলাতে তার ঐ প্রথম দিনের কথা মনে পরে যায়- প্রথম যেদিন হলে আসছিল রনি ডিপার্টমেন্টের রুবেল ভাইয়ের রুম থেকে যখন গণরুমে উঠে তখন রাসেল ভাই তাকে রুমে তুলে দেয়ার সময় বলছিল 'আপাতত এখানে কয়দিন থাক, কয়দিন পর সিট পেয়ে যাবা।' সেই 'আপাতত'র ব্যাপ্তি যে কত কাল সেটা ভাগ্যের খাতা কেউ যদি খুলে না দেখার সুযোগ পায় তাহলে কি অনুমান করা সম্ভব? কস্মিন কালেও না।

এই ঘটনার পর রনি কয়দিন যাবৎ ক্লাসেও যাচ্ছে না। সজল প্রতিদিনই ফোন করে ক্লাসে যাওয়ার আগে, কিন্তু সে কোন রেসপন্স করে না। খোঁজ নিয়ে সে একদিন রনির রুমে গেল। তাকে পেল না। অনেক্ষণ বসে থাকার পর বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে রনি রুমে ঢুকল। রুমে ঢুকেই সজলকে দেখে অনেকটা চমকে উঠল। কিরে তুই এখানে? তুই কীভাবে জানিস আমি এই রুমে থাকি? আশ্চর্য ঘটনাতো! কে বলেছে সত্যি করে বলতো? নয়ন? আশরাফ? সজলের সাথে যাদের চলাফেরা বেশি তাদের কয়েকজনের নাম বলল। সজল কিছুটা বিরক্তি ভাব দেখিয়ে বলল, আজব ব্যাপারতো! আমি তোর বন্ধু না? তোর হলের ফ্রেন্ড, ডিপার্টমেন্টের ফ্রেন্ড, আমি কি তুই কোথায় থাকিস এই খোঁজ খবরটা নিতে পারি না? একসাথে হলে থাকি কিন্তু তুই কতদিন যাবৎ হলে নেই! কিছুটা ভারাক্রান্ত গলা নিয়ে সজল কথাগুলো বলছে। প্রতিদিন তোরে ক্লাসে যাওয়ার আগে ফোন করি কিন্তু তুই কোন রেসপন্স করিস না। যাহোক, ভাবলাম এমন বড় কোন সমস্যায় আবার পড়লি কিনা যেটার জন্য আমার ফোনটা পর্যযন্ত ধরতে পারিসনি। এত দুঃখ বেদনার মধ্য

দিয়ে রনির চোখ দুটোর যে নার্ভসমূহ অশ্রু বিসর্জন দেয়ার কাজ করে, ইতিমধ্যে সেগুলো অকার্যকর হয়ে গেছে, তা না হলে গ্রামে থাকা অবস্থায় তার যে কোমল মনটি ছিল সেই অবস্থা যদি এখন থাকত তাহলে চোখের জলে ভাসিয়ে দেয়ার নামে যে গল্প গান সিনেমা বিদ্যমান রয়েছে সবগুলো সত্যে রুপান্তর হয়ে যেত কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। এই দুর্দিনের খবর তার পরিবারও জানে না, তাই তারা তাকে সান্ত্বনা দিতে আসবে না। যারা জানে তারাও অনেক দূরে। অনেক কাছের বন্ধু আজ রনিকে দেখে শিক্ষা নেয়; ওর মত সময় নষ্ট না করে লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশোনা করলে জীবনে কিছু করতে পারবে। কিন্তু আজ একমাত্র একজনই আসল, যে কিনা খোঁজ নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। সজলের ব্যাপারে রনি ভাল ধারণা পোষণ করত সবসময় কিন্তু ততটা নয়; যতটা আজ মনে হয়েছে।

লেকের পাড়ে নয়ন বসে আছে। একটু মনমরা মনে হচ্ছে তাকে। সেদিন বাড়ি থেকে রুমে আসার পর রুমের দরজার সামনে সজলের সাথে যে কথা হয়েছিল তারপর আর তেমন কথা বলার সুযোগ হয়নি। নয়নের অনেক কাছের বন্ধু ছিল রনি। রনিকে হল থেকে বহিস্কার বা বের করে দেয়ার কারণে তার মধ্যে মনমরা ভাব দেখা দিয়েছে কিনা? নাহ, বাড়ি থেকে যখন আসছিল তখনই তো তার কথাবার্তা কেমন কেমন লাগছিল! কিন্তু কেন? এসব ভাবতে ভাবতে নয়নের কাছে গেল সজল এবং পাশে গিয়ে বসল। সজলের সাথে আশরাফ ছিল। আশরাফ এই কয়েকমাসে সজলের বন্ধু আবার অন্যদিকে ভক্তও হয়ে গেছে একধরণের। সবসময় সজলের সাথেই বেশি চলাফেরা করে। সজলও তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের পাশাপাশি ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ছোটছোট বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সহজ ভাষায় তুলে ধরে। আশরাফও গ্রামের ছেলে অনেক বিষয়ই তার কাছে ভাল লাগে কখনো

অবাকও লাগে। এবং একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে আরো বেশি বিস্তারিত জানার জন্য চেষ্টা করে। তখন সজল তাকে বিভিন্ন বইয়ের সন্ধান দেয় যেগুলোর মাধ্যমে সে যে কোন বিস্তারিত পড়ার ও জানার সুযোগ পায় সাথে সাথে জ্ঞানের জগতে এক ধরণের তৃপ্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। সজল নয়নকে লক্ষ্য করে- কিরে কি হয়েছে, খুলে বলতো? প্রথমে কিছুক্ষণ নিরব থেকে পরে নয়ন উত্তর দেয়, না কিছু হয়নি। তাহলে বাড়ি থেকে আসার পরেই তো দেখছি তোকে কেমন মনমরা মনমরা লাগতেছে। কী হয়েছে বল না একটু- বল। নয়ন কিছুটা রাগের স্বরে বলছে, বললে সমাধান করে দিতে পারবি? সবসময়ই তো শুধু জানতে চাস, কিছু করতে পারছিস এ পর্যন্ত? সে হলে আসার পর কি এমন বিপদে পড়ল যেটার জন্য সজলকে সমাধান করার কথা ছিল কিন্তু তা করতে পারেনি? যাহোক, এমন কথাবার্তা মন খারাপেরই অংশ। এসব কথা ধরে লাভ নেই। তার কাছ থেকে আসল রহস্য বের করতে হবে যে করেই হোক। সজল ধীর কণ্ঠে এবার বলল, হ্যাঁ বল, পারব আমি। নয়ন বুঝতে পারল যে তার কাছ থেকে গোপন করার কোন সুযোগ নেই; আজ তাকে বলেই রেহাই পেতে হবে। পাশে আশরাফ আছে তাই সজলকে চোখ দিয়ে ইশারা করল যে ওকে একটু দূরে যেতে বা ও সামনে থাকলে বলতে একটু সমস্যা হতে পারে ইত্যাদি। সজল কিছুক্ষণ থেমে থেকে আশরাফকে বলল দোস্ত তুই একটু এদিকে যাতো ওর সাথে পার্সোনাল কথা আছে দুই মিনিট----। নয়ন এবার তার বাবার কথা সব খুলে বলল, কী করবে এখন সে কিছু বুঝতে পারছে না। এই পরিস্থিতির মধ্যে সে পড়বে সে কল্পনাও করতে পারেনি। সজল তাকে সাহস দেয়ার চেষ্টা করল তাৎক্ষণিক নিজের যা বলার আছে তা দিয়ে। সাথে সাথে তাকে কোরানের সেই আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দিল- তোমরা আল্লাহর কাছে সবর ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য পার্থনা কর এবং বলল পৃথিবীতে আসলে আমাদের হারানোর বা ক্ষতি হওয়ার কিছু নেই। কেননা আল্লাহই তো কোরানে ঘোষণা করেছেন- নিশ্চয়ই আমার নামাজ , আমার

কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব আল্লাহর জন্য; যেটি আমরা প্রতিদিনই নামাজে দাঁড়ানেরা সময় স্মরণ করি। অন্য আয়াতে এসেছে- অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ, জীবন ও ফসল ফলাদির লোকসান-ক্ষতির মাধ্যমে। বেশি বিস্তাররিত বলারও সুযোগও ছিল না তাই নিজের কথা দারা সান্ত্বনা বেশি দেয়ার চেয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণীই সবচেয়ে উপযোগী। আশরাফকে ডাক দিয়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হল সজল। কিছুক্ষণ পরেই মাগরিবের আজান হবে। একটু আগেই অজু সেরে মসজিদে ঢুকবে ওরা এই পরিকল্পনা আগে থেকেই নিয়ে রেখেছিল। আজ নয়নকে আলাদা করে নামাজের জন্য বলেনি সজল। কেননা তার মনে একটি বিশ্বাস ছিল মনের হতাশা ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মুহূর্তে একমাত্র প্রতিষেধক হল আল্লাহর বাণী স্মরণ। সংশ্লিষ্ট সমস্যার মহান সৃষ্টিকর্তা কী সমাধান দিয়েছেন সেটা খুঁজে বের করাই সবচেয়ে বড় ঔষুধ। আর এই বড় ঔষুধটি যখন প্রয়োগ করা হয়েছে তাই আজ কার্যকর হবে এটাই নিশ্চিত। অযু করতে করতে মসজিদে ঢুকছে ওরা দুজন। তন্মধ্যে আজানও হচ্ছে মসজিদের মাইক থেকে। নয়ন এখনও বসে আছে আগের জায়গায়। মুযাজ্জিন প্রথমবার যখন হাইয়া আলাস সলাহ বলছে তখনও নয়ন স্বীয় অবস্থানে। দ্বিতীয়বার বলার পর একটু নড়ে চড়ে বসল সে। আজানের শেষ বাক্যটি শেষ হতে না হতেই শরীরটাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়াল নয়ন এবং সোজা মসজিদের দিকে হাটা ধরল। মসজিদের জানালা দিয়ে সজল ‘সজল নয়নে’ তাকিয়ে আছে, আর মনে দোয়া করছে হে আল্লাহ তুমি তাকে ও তার পরিবারকে সকল বিপদ- আপদ-পরীক্ষা থেকে উদ্ধার কর। সবাইকে সঠিক পথ দেখাও হে প্রভু। ইত্যাদি। তড়িগড়ি অজু করে মসজিদে একটি পা রাখতেই নয়নের ‘নয়ন যুগল’ সজলের সজলা চোখের উপর আপতিত হল। দুজনে দুজনকে বুঝতে পারল। অতপর একটি মুচকি হাসি দিয়ে নামাজের কাতারে শরীক হয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে নামাজ শুরু করল।

অনেক ভয় ও সংশয় নিয়ে রনি আজ ফোন দিয়েছে হলের সভাপতিকে। ফোন ধরতেই আচ্ছামত গালাগাল দিয়ে তারপর কথা শুরু করে সভাপতি। কথাবার্তার এক পর্যায়ে রনি হলে যাওয়ার অনুমোদনের লক্ষণ খোঁজে পায়। হলে গিয়ে সরাসরি সভাপতির রুমেই প্রথম পা রাখে সে তারপর আকুতি মিনতি যা প্রয়োজন তাই করে। সভাপতির কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যেন আগের ফোনালাপ থেকে যে অনুমোদনের লক্ষণ দেখেছিল তা নিতান্তই ভুল ধারণা ছিল। কিন্তু কিছুএকটা না করে যাবে না রনি এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই সে এসেছে। অবশেষে সভাপতি বলে দিলেন, ঠিকাছে থাক তোর মত কিন্তু কোন দিন আমার চোখের সামনে যেন না পড়িস। ফার্স্ট ইয়ারে পড়িস এখনই এত বেড়ে গেছিস! ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহোক, এবার একটা হিল্লাহ হল অন্তত অন্যজনের হলে থাকার চেয়ে নিজের হলে ছাদের উপরে থাকাও অনেক শ্রেয়। কিছুটা প্রফুল্ল মন নিয়ে রনি সভাপতি সাহেবের রুম থেকে বের হয়ে আসে।

আগের মত বন্ধুরা দেখা হলে কথা বলেনা রনির সাথে। খুব কাছের বন্ধুদের অনেকে দেখে না দেখার ভান করে পাশ দিয়ে চলে যায়। কেউ শুধু হায় হ্যালো বলেই শেষ। সারাদিন বাহিরে বাহিরে নানা জনের সাথে আড্ডা দিয়ে আর ক্লাস থাকলে ক্লাস করে দিনের সময় কাটায়। আর রাতে ঘুমানোর সময় কেবল হলে এসে ঘুমায়। হলের প্রোগ্রামে তো যাওয়ার সুযোগই নেই। সভাপতির কড়া নিষেধ। কারণ কয়দিন পরই নতুন করে কমিটি দিবে। এখন রনির মত বহিস্কৃত কাউকে প্রোগ্রামে দেখা গেলেই সংবাদের শিরোনাম হবে হলের সভাপতি, ‘বহিস্কার হওয়ার পরও দলের সকল কার্যক্রমে সরব উপস্থিতি ছাত্রনেতার।’ কয়দিন পর কমিটি দিবে আর কমিটিতে পোস্ট পেতে হবে এমন কোন ইচ্ছাই তো রনির ছিলনা। আর রনি কমিটি আর পোস্ট এই পরিভাষা

গুলো শুনেছেই কেবল কয়দিন হল। রনির তো একটি ছিটের প্রয়োজন ছিল যেখানে সে দিন রাত পড়াশোনা করবে। আর এভাবে চোরের মত কতদিন হলে থাকা যাবে? নিজেকে নিজের কাছে খুব বেশি অপরাধী মনে হচ্ছে। আর একমাস পর ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষা আসলে রনির মৃত ও দিশেহারা বিবেকটা একটু হলেও জাগ্রত হয়। জীবনের রেখে আসা দিনগুলো মনে পড়তে থাকে। ফিরে যেতে চায় আরেকবার সেই দিন গুলোতে। কিন্তু কোন উপায় কি আছে আদৌ?

সুযোগ পেলে ডিপার্টমেন্টের বন্ধুদের কাছ থেকে বই টই নিয়ে পড়াশোনা করে তাও দশ পনের মিনিটের বেশি বসে থাকতে পারে না। নানান ধরণের চিন্তা ভাবনায় মস্তিষ্কটা ভারী হয়ে যায়। মাথা ব্যাথা শুরু হয়। বই খাতা রেখে অল্পদিনের গড়া অভ্যাসটির দু একটানে চর্চা করলে মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা হওয়ার পথ ধরে।

কাল পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপের লাস্ট দিন। কিছু টাকা বাড়ি থেকে আর কিছু টাকা এক বন্ধু থেকে ধার নিয়ে ডিপার্টমেন্টে যায় রনি। অফিসের সামনে দেখে নোটিশ বোর্ডে একটা লিস্ট টানানো। কৌতুহলী ভাব নিয়ে আরেকটু কাছে গিয়ে চোখ বুলায় সে। টানানো লিস্টটিতে কয়েকটি নাম আর উপরে একটি শিরোনাম। শিরোনামটি হল- ক্লাসে অনেক কম উপস্থিতির কারণে যারা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আরোপিত কঠিন নিয়ম রয়েছে তবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ভেদে এই নিয়মটি বাস্তবায়নে শিথিলতা বা কঠোরতা করা হয়। আরেকটু নজর দেয়ার পর রনি দেখে তার নামও সেই চার-পাঁচ জনের সাথে লিপিবদ্ধ করা আছে। আকাশ থেকে পড়ল সে। এখন কী করবে? কী উপায়? অফিস রুমে গিয়ে অফিস সহকারীর সাথে কথা বলে

নোটিশটির ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চায়। নোটিশ পড়ে রনি যা বুঝেছিল অফিস সহকারীও তাই ব্যাখ্যা করল। তবে একটি পথ তাকে বাতলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল; সেটি হল- চেয়ারম্যান স্যারের নিকট দরখাস্ত নিয়ে গেলে স্যার যদি ইচ্ছা করেন তাহলে বিষয়টি জরিমানার আলোতে কিছুটা সহজ হতে পারে। জটপট দরখাস্ত লিখে চেয়ারম্যান স্যারের কাছে যাবে সে। জীবনে রনিকে বহু দরখাস্ত লিখতে হয়েছে, তবে সেগুলো ছিল বেতন বা পরীক্ষার ফি মওকুফের জন্য। কিন্তু দরখাস্ত লিখার পর জানতে পারল চেয়ারম্যান স্যার একসপ্তাহের জন্য বিদেশে একটি কনফারেন্সে গিয়েছে। স্যার আসতে আসতে সমস্যার সমাধান তো দূরে থাক তার সাথে দরখাস্ত নিয়ে শাস্তি মওকুফের দরকষাকষির আলাপও তো করা যাবে না এর মধ্যেই হয়ত প্রথম পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। শুনা গেছে এসব ব্যাপারে রানিং চেয়ারম্যান খুবই সিরিয়াস, তাই ভারপ্রাপ্ত যিনি আছেন সে এই ব্যাপারে কোন কথাই শুনতে চাইলেন না। ডিপার্টমেন্টের এক বড় ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ পেল অবশেষে। বড় ভাইয়ের এ ব্যাপারে ভাল অভিজ্ঞতা রয়েছে, কারণ তাকেও গত বছর প্রায় একই কারণে ইয়ার ড্রপ দিতে হয়েছে। তার কাছে পরামর্শ করে রনি নতুন করে ভাবার সুযোগ তৈরি করে নিল। মানে আবার ফার্স্ট ইয়ার।

বটতলায় বসে মাথাটা নিচু করে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করছে কী করা উচিত এখন। রনি ভাবল এবার ঘুরে দাড়ানোর সময় হয়েছে। পিছনের সব কিছু ভুলে গিয়ে আবার প্রথম থেকে শুরু করবে। কিন্তু যাই করুক না কেন থাকার মত তো একটি জায়গা প্রয়োজন। মানে হলে উঠতে হবে। সে তো আবার হল থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তাও দুই বছরের জন্য।

সবার পরীক্ষা শুরু কিন্তু রনির ছুটির দিন। দীর্ঘদিন বাড়ি না যাওয়াতে তার মনটা বাড়ি যাওয়ার জন্য অনেক উদগ্রীব হয়ে আছে। প্রতিবার বাড়ি যাওয়ার আগে যে উৎফল্ল ভাব থাকে এবার আর সেই উৎফল্ল অবস্থাটা কাজ করছে না। কেমন যেন একটি মনমরা চেহারায় বাড়িতে গিয়েছে। বরাবারের মত বৃদ্ধবাবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও খোঁজ খবর নিয়ে বড় ভাইয়ের সাথে কথা বলে। ঢাকা থেকে বাড়ি গেলে সবসময়ই রনির জন্য বিল থেকে ধরা জিইয়ে রাখা মাছ ভূনা আর নিজের হাতে পালিত দেশী মুরগীর তরকারী ভাবি রান্না করে। ছোট কাল থেকেই তো রনি ভাবির আদরে বড় হয়েছে। শিশু বয়সে মা মারা যাওয়ায় ভাল মন্দ যাই খেয়েছে ভাবির হাতেই সব হয়েছে। এখন যেহেতু বাড়ির বাহিরে থাকতে হয় তাই অনেক দিন পর পর বাড়ি যাওয়ার কারণে আদর যত্নটা একটু বেশিই পায় রনি। তাছাড়া বড় ভাই রনিকে নিয়ে যে স্বপ্ন সর্বদা দেখে দীর্ঘ প্রতিক্ষার প্রহর অত্যন্ত ধৈর্যর সাথে গুনছেন সেই একই স্বপ্নের আরেকজন নিরব দর্শক হলেন তার ভাবি। পড়াশোনা করে যেহেতু পরীক্ষা দিতে হয় আর পরীক্ষা সাধারণত বছরের শেষেই হয়ে থাকে এই ব্যাপারটি পড়াশোনা না জানা কৃষক বড় ভাই রনির পড়াশোনা জীবন থেকেই শিখেছে। রাতে সবাই এক সাথে বসে খাওয়ার দাওয়ার পর বড় ভাই জানতে চায়, বছর প্রায় শেষ, পরীক্ষা তো দিয়ে এসেছ নাকি? কেমন হল? এ প্লাস পাওয়া যাবে তো? রনি বিগত সব পরীক্ষাতে এ প্লাস পেয়েছিল তাই বড় ভাই কেবল এ প্লাস রেজাল্টের সাথেই পরিচিত। বড় ভাইয়ের মনে উদয় হওয়া প্রশ্নের মধ্যে নির্বোধ আশার আলো ঠিকরে পড়ছে, আর সেই আলোর প্রতিটি রশ্মি রনির মনের সাগরে প্রবল জোয়ার তুলে দিচ্ছে। এই জোয়ারের ভাটা কিভাবে পড়বে বুঝে উঠার আগে তার চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নানা বিষয় মানিয়ে নেয়ার অভ্যাস ঠিকঠাক মত কাজে লাগাতে তাৎক্ষণিক প্রস্তুত হয়ে গেল রনি। কাঁপা গলায় অশ্রুসিক্ত নয়ন দুটোকে আনন্দ আর অতিসুখবরের সাথে মিলিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ইতিবাচক উত্তর দিয়ে বড়ভাইকে

আনন্দিত করতে ভুল করলা। সাথে সাথে ভাবিকেও। পরিস্থিতি মানুষকে কৌশল শিখিয়ে দেয়। কিন্তু এই কৌশলকে প্রয়োগ করতে অভ্যাসেরও ঢের প্রয়োজন।

বৃদ্ধ বাবার চোখের দিকে তাকালে তার মধ্যে কোন বড় প্রত্যাশা লক্ষ করা যায় না। তার নিজের জীবন নিয়েই যেন দিন রাত ভাবনা করে কাটায় কখন যে তাকে পরপারে পাড়ি জমাতে হবে। সংসারের গ্লানি টানতে টানতেই তাকে বৃদ্ধের কাতারে এসে পৌঁছতে হয়েছে। সকাল থেকে ক্ষেতে খামারে কাজ করতে করতে তার দিন কেটেছে আর সন্ধা হলে দুচার মুঠ ভাত পেটে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই জীবন সংসারে এর বাহিরে অন্য কোন স্মৃতি নেই তার। ধর্ম কর্ম সম্পর্কেও তার তেমন অভিজ্ঞতা নেই। জোয়ানকালে বউ বেঁচে থাকতে মাঝে মাঝে বউয়ের কথায় মজজিদে নামাজ পড়তে যাইত। কিছু দিন আগে পর্যন্ত পূত্রবধুর আদেশে মসজিদে যাওয়া লাগত। তখন হাটাচলা করতে পারত সে। এই কয়েকদিন যাবৎ হাটা চলাও করতে পারে না তেমন। টয়লেটে যাওয়া ছাড়া বিছানা থেকে উঠা হয় না। দিন রাত বুঝার ক্ষমতা দিন দিন হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। নাতি নাতনির সাথে হাসিমুখে কথা বলার কোন ইচ্ছাও তার মধ্যে এখন জাগ্রত হয় না। আগের কোন স্মৃতি ভাসে না মস্তিষ্কে। কেউ কোন কিছু বললে হ্যাঁ – না উত্তর দিতে পারে শুধু। কেমন যেন ভয় আর সংশয় সদা কাজ করে তার মনের মধ্যে। শুনেছে মৃত্যুর যন্ত্রণা অনেক কঠিন। কবরের আজাব বড়ই শক্ত। জাহান্নাম খুবই কষ্টদায়ক জায়গা। অবুঝ মনে দিন দিন এসব ভয়ই বেড়ে চলছে। কিন্তু বুঝানোর মত শক্তি সামান্যটুকুও তার বর্তমান নেই। বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়া দেয়ার সময় শুধু রনিকে শুয়া থেকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে এটুকুই বলেছিল, ‘বাবা ভাল করে চলা ফেরা করিস। সাবধানে থাকিস।’

পবিত্র কোরানের একজায়গাতে উল্লেখ আছে মদে উপকার রয়েছে কিন্তু তার উপকারের চেয়ে ক্ষতির দিকটাই বেশি। রনি ফার্স্ট ইয়ারের পলিটিক্স জীবনে যে শুধু ক্ষতিই কামাই করেছে ব্যাপারটা এমন নয়। অনেক মানবতাবাদী কাজও করেছে; তার হিসাব অনেক। এই যে বেশিদিন আগের ঘটনা নয়, রাত নয়টা বাজে কোন এলাকা থেকে এক বৃদ্ধ অসুস্থ লোক এসেছে। হলের গেস্ট রুমে বসে কি কান্না! সেকেন্ড ইয়ারের বড় ভাইয়েরা রনিকে বলল তোর বন্ধুদের নিয়ে পুরো হলের সব রুমে রুমে গিয়ে এই মুরুব্বির জন্য কিছু টাকা তুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা উদার হস্তে দান করে। আগামীকালের জন্য পকেটে নাস্তার টাকা না থাকলেও অসহায়দের সহযোগিতায় অধিকাংশ ছাত্রদের মধ্যেই দেখা যায় নিবেদিত প্রাণ। সেদিন অনেক টাকাই উঠেছিল। গেস্ট রুম থেকে রুমে ফিরার সময় পিছন ফিরে যখন অসহায় বৃদ্ধ লোকটির হাসি দেখতে পেয়েছিল তখন মনে হয়েছিল স্বর্গ থেকে বড় কিছু সে অর্জন করতে পেরেছে। তার নেতৃত্বে এমন কাজ অনেক হয়েছে এ যাবৎ।

আরেকটি ঘটনাও বলা যায়, ঢাকা মেডিকেল থেকে এক মহিলা এসেছেন রক্তের জন্য; পুত্রবধুর ডেলেভারি কেইস। তিন চার ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন। দিশেহারা মহিলাটাকে দেখে রনির দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বুকে পাহাড় সম একটি পাথর চাপ দিয়ে ধরেছে। বিভিন্ন হলের কয়েকজন বন্ধুকে নানা ভাবে বলে চার ব্যাগ রক্ত ম্যানেজ করেছিল। হাসপাতালে গিয়ে সদ্য জন্ম নেয়া ফুটফুটে সন্তানটিও দেখতে গিয়েছিল কয়েকজন বন্ধু সমেত। জন্মদাতা মার শুকনো চেহারাটার মধ্যে কৃতজ্ঞতার কী ছাপ যে দেখা গিয়েছিল ঐ দিন সেটি কোন বক্তা বা লেখক তার বক্তৃতা বা লেখায় প্রকাশ করতে অক্ষম। এগুলোকে কবি সাহিত্যিকরা বলেন, স্বর্গীয় সুখ। আকাশ থেকে জিবরিল ফেরেস্তা এসব সুখ তার ৬০০ ডানায় করে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ

ব্যক্তিদের বিশেষ বিশেষ কাজের দরুণ দিয়ে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একবছরের জীবনে এমন মহৎ কাজ যা হয়েছে তার সংখ্যা অগণিত। তথা এতক্ষণ ধরে এই মহৎ কাজের যত বিবরণ হয়েছে তার সবই কিন্তু হয়েছে তার প্রথম বর্ষের জীবনে। আরো তো হাতে চার বছর পরে আছে।

বাড়ি থেকে ফিরে রনি সোজা হল সভাপতির রুমে যায়। যে করেই হোক একটা সমাধান করতে হবে। এই কয়েকদিনের ভিতরে পার্টির কমিটি দেয়ার কথা থাকলেও আবার চার পাঁচ মাস পিছিয়ে দিয়েছে। সভাপতি সিগারেট মুখে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড ধরে একটি টান দিয়ে অতি সন্তর্পণে শৈল্পিক কায়দায় মুখ খানা গোল করে ধোয়ার কণিকাগুলো ছড়াচ্ছেন। এর মধ্যেই চোখ পড়ল রনির আকস্মিক আগমন। সভাপতির মাথার মধ্যে টেনশন কাজ করছে ধোয়া ছাড়ার পদ্ধতী দেখেই মনে হচ্ছে। হ্যান্ড শেইক করে পাশের চেয়ারে রনি চুপ করে বসে গেল।
সভাপতি: কিরে কী খবর?
রনি: ভাল ভাই।
সভাপতি: বললাম না তোরে যেন আমি কোন দিন হলে না দেখি? একটা সাংবাদিক যদি এখন তোরে আমার সাথে দেখে আমার সব শেষ হয়ে যাইব না?
রনি: ভাই, এবার একটা সুযোগ দেন। আপনি যা বলবেন তাই করব। আমার আর কোন জায়গা নেই ভাই। অনেক বিপদ থেকে বেঁচে যাব ভাই যদি এবার একটু সুযোগটা দেন।
সভাপতি: পড়িস তো মাত্র ফার্স্ট ইয়ারে দুদিন পর সেকেন্ড ইয়ারে উঠবি; যা বলি সব করতে পারবি?
রনি: জ্বি ভাই সব পারব।
সভাপতি: ওকে। তাহলে এ কথাই থাকল। আজ রাতে আমার সাথে দেখা করিস।

রনি মনে মনে বড্ড খুশি হয়ে তার ভিতরের আধ্যাত্মিক জগতে লাফাতে শুরু করল। এবার মনে হয় সব হতাশা ঘুচতে শুরু করল।
আগের কথা অনুযায়ী সভাপতির সাথে দেখা করতে চলে গেল। সভাপতি সুন্দর একটি মুচকি হাসি দিয়ে রুমে ঢুকতে বললেন। সাথে একটু মাতৃমায়া প্রকাশ করে চেয়ারে বসতে দিলেন।
সভাপতি: কিরে রনি বিড়ি খাস?
রনি: ইয়ে ভাই বেশি না মাঝে মাঝে তবে এখন খাবনা----
সভাপতি: আরে তুই আমার ছোট ভাই না? ফ্রেন্ডলি সম্পর্কে বড় ছোট চিন্তা সবসময় মাথায় রাখা যায় না, বুঝছস?
রনি: জ্বি ভাই।
সভাপতি: এই নে। সিগারেটটা ধরা।
দুজনে দুটা সিগারেট ধরিয়ে টানছে। সভাপতি মোবাইলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চেটিং-মেসেজিং করে যাচ্ছে। আর রনি অধীর আগ্রহে তার উপর আরোপিত হওয়া কাজের জন্য অপেক্ষা করছে। বন্ধুদের সাথে সিগারেট খাওয়ার স্বাদ এখানে অনুভব হচ্ছে না। এভাবে করে আধা-পৌনে এক ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে গেল। রাত ১২টা হঠাৎ একটা ফোন আসল। সভাপতি ফোনটা রিসিভ করে ফিস ফিসিয়ে কী যেন বলে ফোনটা রেখে দেয়ার আগে ‘আচ্ছা আমার ছোট ভাই আসতেছে” আপনি একটু ওয়াইট করেন বলে রনিকে হাত দিয়ে মুখের কাছে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করল। রনি ফোস করে চেয়ার থেকে উঠে সভাপতির মুখ বরাবর গিয়ে কোমড় বাঁকিয়ে দাঁড়াল।

সভাপতি: ঠিক শাহবাগ থানার পিছনে শিশুপার্কের গেইটে যা। এই ধর ৫০ টাকা। রিক্সা দিয়ে যাবি-আসবি। একটা নম্বর লেখ। দুইটা কার্টুন দিবে। এগুলো নিয়ে কারোর সাথে কোন কথা না বলে সোজা আমার রুমে চলে আসবি।

রনি ক্ষিপ্র গতিতে হল গেইটে গিয়ে রিক্সায় চড়েছে। ফাঁকা রাস্তা। কোন মানুষ-জন নেই। মাঝে মাঝে দুই একটা ট্রাক-পিকাপ শা করে রিক্সাটিকে অতিক্রম করে চলে যায়। মানুষও দু চারজন দেখা যাচেছ। রাস্তার পাশে ফুটপাতে সারি সারি ঘুমন্ত মানুষের দৃশ্য। একটি বছরই তো সে রাতের বেলায় ক্যাম্পাসের আনাচে কানাচে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে। কিন্তু চারপাশের দৃশ্যগুলো যেন আগের চেয়ে একটু বেশি পরিস্কার হচ্ছে দিন দিন। দৃশ্যগুলোর ব্যাখ্যাও আগের চেয়ে ভিন্ন মনে হচ্ছে। দু তিন মিনিটে শিশুপার্কের গেইটে হাজির। ফোন নম্বরটি রিক্সায় বসে তুলা হয়েছে। রিক্সা থেকে নেমেই ফোন করে ওপাশ থেকে একটি ভারী কণ্ঠ শুনতে পেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কার্টুন হস্তান্তর করে নির্দেশনা অনুযায়ী দ্রুত হলের দিকে ফিরতি রিক্সা বাড়া করে রনি। তবে এবার একটু কষ্ট হয়েছিল তাকে রিক্সাটা ম্যানেজ করতে। ফিরতে ফিরতে কার্টুন গুলোর ভিতরে কী আছে অভিজ্ঞতার স্বল্পতার কারণে বুঝা না গেলেও অনুমান করা গেছে ঢের। কাঁচের কিছু বোতলের টুন টুন আওয়াজ আন্দাজ করা গিয়েছিল কার্টুন গুলোর ভিতর থেকে। হল গেইটে আসতেই দুজনের উপস্থিতি লক্ষ করেছে রনি। বুঝা গেল ওরা একটি রিক্সা, মাঝারি গঠনের একটি ছেলে ও দুটি কার্টুন ইত্যাদি আলামতের অপেক্ষায় রয়েছে। যেতে না যেতেই দুজনের হাতে দুটি কার্টুন চলে গেল আর রনিকে বুঝিয়ে দিল, ‘সবকিছু বড় ভাইয়ের নির্দেশনা মাফিকই হচ্ছে। আর আজকের মত তোমার দায়িত্ব এখানেই শেষ, ঘুমানোর আগে ভাইয়ের সাথে দেখা করিও।”

চা-টা খেয়ে রুমে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সভাপতির রুমে যাওয়ার জন্য রেডি হবে। ততক্ষণে রাত প্রায় দুটা বেজে গেছে। রনি সভাপতির রুমের দরজায় নক করে ভিতরে ঢুকতে দেখে ভাই গ্লাসের সর্বশেষ চুমুকটি দিচ্ছেন। এক হাতে সিগারেট অপর হাতে সাদা ধবধবে কাঁচের গ্লাস। সামনে রাখা চেয়ারের উপর একটি বোতল। মোটা গলায় সভাপতি রনিকে কাছে ডাকল ও বসতে বলল। রনি এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সভাপতি: কোন ঝামেলা হয়নি তো?
রনি: না ভাই।
সভাপতি: হুম, শুনলাম ভালই পারফরমেন্স দেখাইছিস। তো, এই নে টাকাটা রাখ।
রনি: না না ভাই কি বলছেন এসব? লাগবে না ভাই।
সভাপতি: আরে নে, লাগবে না কেন? লাগবে লাগবে; না লাগলে চলবি কেমনে? আমারও তো লাগে তোর আবার না লাগে কীভাবে। তো আজ খাইবি দুই এক চুমুক? আরেকটা গ্লাস আছে টেবিলের উপর। খেয়ে যা। আর আজ থেকে এটিই তোর কাজ। লেগে থাক। কমিটি দিব কয়দিন পর। আল্লার রহমতে ভাল একটি ভাইটাল পোস্ট পাবি।
রনি: না ভাই। আজ যাই তাহলে। এই বলে হ্যান্ড শেইক করে রনি সভাপতির রুম থেকে প্রস্থান করল।
একটা সূক্ষ্ম ঘৃণা জেগে উঠেছে তার মনের ভিতরে। মনে মনে ছি! ছি! করতে লাগল। কী করেছে সে। পকেট থেকে টাকাটা হাতে নিয়ে ছিড়ে নিচে ফেলে দিতে মন চাচ্ছে তার। ফার্স্ট ইয়ারে একদিন এক বন্ধুর মোবাইলে পতিতাবৃত্তির উপর একটি প্রতিবেদন দেখেছিল। প্রতিবেদনটি দেখার পর তখন রনির মনে সেসব অসহায় মা বোনদের প্রতি মায়া ও অনুকম্পা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সেই মা বোনেরা যে ফাঁদে পড়ছে প্রতিনিয়ত, রনিও সেই ফাঁদে পা দিয়েছে ইতিমধ্যেই। চোখ জোড়া দিয়ে কান্নার স্রোত বয়ে আসছে। নাহ তাকে তারপরেও আশাহত হলে চলবে না। তাকে আবার স্বাভাবিক পড়াশোনার জীবনে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু কাজ না করলে তো সব শেষ। আবার আগের মত হয়ে যাবে সবকিছু।
নাহ! তাকে পড়ার জন্য সবকিছুই মাথা পেতে নিতে হবে।

নয়ন বেশ কিছু দিন ধরে বাড়ি থেকে টাকা আনতে পারে না। বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করে দশ পনের দিন ধরে খাওয়া দাওয়া করছে। এ ব্যাপারে সজল তেমন কিছু জানে না। কারণ, ইদানীং সজল যখনই নয়নের সাথে সঙ্গ দিতে যায় তখনই যেন তার মনটা আরো খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য সাধারণ ছেলে পেলেদের সাথে ঠিকই সারাদিন ডুবে থাকে। কি জানি! মনে হয় সলজকে দেখলে তার দুঃখ-কষ্ট দ্বিগুণ আকার ধারণ করে; মনে হয়ে যায় অনেক কিছু। তাই সে সাধারণ ছেলেদের সাথে মিশে থেকে সবকিছু ভুলে থাকতে চায়। তবে নয়নের পারিবারিক অবস্থা খুব খারাপ যাবে এটা সরাসরি তার মুখ থেকে নতুন করে শুনার প্রয়োজন নেই। আন্দাজ করেই ধরা যায় যে তাদের অবস্থা অনেক খারাপ না হলেও মোটেও ভাল না। নয়নের বাবা কয়েকমাস ধরে জেলখানায় আটক অবস্থায় আছেন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার স্বীকার। নয়নের মা অনেক কষ্ট করে সবকিছু সামাল দিচ্ছেন। পরিবারের অন্যান্যদের সবসময় ভাল রাখতে ভাল থাকতে সাহস যোগান সবসময়। ধৈর্যর উপদেশ দেন। ছেলে নয়ন কে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। কিন্তু তার বাবা কারাগারে যাওয়ার পর থেকে তাকে কেমন যেন আনমনা দেখছে তার মা। বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় ভারী ভারী একটা মেজাজ নিয়ে বিদায় নিয়েছিল তারপর থেকে তেমন নিজে কখনো ফোন দেয় না। তার মা ফোন দিলে চট চট ভাষায় দুই-চারটা কথা বলে ফোন রেখে দেয়। নয়নের আরেকটা ক্ষোভ হল তার মাকে নিয়ে। তিনি তো পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা। তার কথায় পুরো পরিবার উঠে বসে। কিন্তু তিনি একবারের জন্যও তার স্বামী তথা নয়নের বাবাকে এমন আদর্শের রাজনীতি করার ক্ষেত্রে বারণ করেনি। শুধু কি তাই? এমন বিপদের মুহূর্তেও জেলখানায় গিয়ে দেখা করার সময় বাবাকে তিনি সাহস দিয়ে আসেন। এ কেমন মানুষ! নয়ন যেন দিন দিন তার মেজাজকে কামারের হাঁপড়ে গিয়ে গরম করে নিয়ে আসে। দিনের পর দিন তার জিদ রাগ ক্ষোভ বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে মনের ভিতর এক বাষ্পীয় পাহাড় তৈরী করছে।

এই বিষাক্ত বাষ্পের চারপাশে খুবই ক্ষীণ পাতলা আবরণ। যে কোন সময় সেই আবরণে ছেদ পড়ে বিষাক্ত বাষ্প চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ভয়াভহ বিপর্যয় হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল।

অনেকদিন পর সজলের সাথে নয়নের দেখা হওয়াতে সজল একটি দরদ মাখা হাসি দিয়ে সামনে এগিয়ে হ্যান্ডশেইক করে। একদিক থেকে দরদমাখা হাসি উঁকি দিলেও অন্যদিক থেকে ঘন কাল মেঘ নয়নের চেহারা ঢেকে দিয়েছে। মনে হয় যেন এখনই বজ্রপাত শুরু হয়ে যাবে। বজ্রপাত হওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছে সজল। তাহলে হয়ত অন্ধকার ভাবটা কেটে যাবে।
সজল: কী খবর এখন আঙ্কেলের?
প্রশ্নটি শুনে যেন নয়নের মাথা আরো খারাপ হয়ে গেল।
নয়ন: আর বলিস না। ঐ লোকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে অনেক আগেই। এখন জেলখানায় আছে। তো সেখানেই তো থাকবে। পাগলা গারদে থাকলে আরেকটু ভাল হত উনার জন্য। কথা গুলো সে এক শ্বাসে গলা থেকে বের করল।
সজল ইচ্ছে করেই তার কথা গুলো কিছুক্ষণের জন্য কানের বাহিরে রেখে অন্য প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।
: মামলার কতটুকু হয়েছে। শুনেছিলাম ৫৪ ধারায় মামলা হয়েছিল। যেই মামলা দিয়েছে তার জন্য তো এতদিন জেলে থাকার কথা না। পরে কি অন্য মামলা দিয়েছে আবার?
নয়ন: কী জানি! এসব খোঁজ নেয়ার সময় আমার নেই। যার যার কবর তার তার খবর। আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামাবো কেন।
সজল এবার তাকে ছাড় দিতে চাইলেন না।
: কি বলছিস তুই এসব? তোর বাবা আর তুই পরিবারে বড় ছেলে। তুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র। আর তুই তো অন্য চার-পাঁচটা ছেলের মত নয়। তোর বাবার যেমন একটি আদর্শ আছে; তুই ই

তো তোর বাবার আদর্শ দেখে বড় হয়েছিস। ঐ আদর্শের উপর থাকার কারণেই তো আজ তুই এ পর্যন্ত আসতে পেরেছিস।
নয়ন: এতক্ষণ যা বলছিস অনেক হয়েছে। হ্যাঁ, আমি ঐ আদর্শের উপর বড় হয়েছি। কিন্তু সারাজীবন ওটার উপরই থাকতে হবে সেটা কি আমাকে অন্য কেউ নির্ধারণ করে দিবে? সেটা তো আমিই নির্ধারণ করব। কই তোদের নেতা কর্মীরা? সারাদিন তো ওয়াজ নসিহত করে। ধৈর্যশীল হতে হবে। এই হতে হবে, সেই হতে হবে। কত টাকাই তো এ পর্যন্ত বাবা তোদের দলের জন্য খরচ করেছে। কই এখন ছাড়িয়ে আনতে পারে না কেন? আমার পরিবারটা তো তার জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। আদর্শকে পুঁজি করে মাথায় নিয়ে ঘুরলে কি পেটে খাবার আসবে?
সজল নয়নের ভাষাগত দিকটি বিবেচনা করে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেল। কী বলছে সে এসব! এই কয়দিন আগেই তো ছেলেটা কত আদর্শবান ছিল! কত ভাল পরিবারের সন্তান সে! তার বাবা কত ত্যাগ দিচ্ছে! সাথে তার মা ও অবুঝ ভাই বোনেরাও; কিন্তু তার অবস্থা এমন হয়ে গেল! এমন বিপদে পড়লে তো মানুষ খারাপ থাকলে ভাল হওয়ার চেষ্টা করে। চরম জঘন্য মানুষও জায়নামাজ নিয়ে মসজিদের দিকে পা রাখে। এসব কথা তার মাথায় কয়েক ন্যানো সেকেন্ড ঘুরিয়ে তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ফিরে এসে বলতে শুরু করল-
: দেখ, সবসময় সব কিছু করা যায় না। পরিস্থিতি ও সবসময় এক রকম থাকেনা। পরিস্থিতি অনুযায়ীই তো আমাদের কাজ করতে হবে। এটাইতো আমাদের প্রিয় নবী শিখিয়েছেন। কখনো চরম অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করার উপদেশ দিয়েছেন। কখনো প্রতিরোধ করেছন। কখনো বা অন্যায়কে সামনে গিয়ে অঙ্কুরেই বিনাশ করেছেন। আর তুই নিজেই কত মানুষকে বুঝিয়েছিস, ঈমানদারগণ যখন বিপদে পড়েন তখন তারা বলেন আমরা আল্লার জন্য আর আল্লার দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

আল্লাহ তো আমাদেরকে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতে বলছেন। আর রাসূল(সা) যখন------
সজলের মুখের কথা শেষ না হতেই অনেকটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে নয়ন বলল,
: এসব আদর্শ টাদর্শ রাখ। আগে একসময় করছি এখন আর করি না। একসময় ভুল করেছি তাই বলে সারা জীবন ভুল করব নাকি। টি.এস.সিতে আমার কাজ আছে জরুরী। আর তুই আমার বন্ধু তোর প্রতি আমার একটা অনুরোধ কোন দিন আমার সাথে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলবি না। এই বলেই সে সোজা হাটা ধরল।
সজল নিজেকে ক্ষণিক সময় বিব্রত অবস্থায় পেলেন। পরক্ষণই আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ সবাইকে সঠিক পথের দিশা দাও।" ধীর পদক্ষেপে ক্লান্ত একটি হৃদয় নিয়ে রুমে এসে শরীরটাকে বিছানার সাথে এলিয়ে দিল সজল। আজ নিজেকে অপারগ মনে হচেছ। জীবনে কতজনকেই তো সে অনেক খারাপ পথ থেকে ভাল পথে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ একটি ভাল ছেলে তার চোখের সামনেই বিপথে চলে যাচ্ছে। এসব ভাবতে ভাবতেই তার চোখ দুটো নিদ্রার সাগরে ডুবে গেল।
কিছুক্ষণ পর দেখছে পশ্চিমে দুটি সূর্য একসাথে ডুবে যাচ্ছে। তার চারদিকে ভয়ানক অন্ধকার দল বেধে আসছে। আর অপরদিকে একই সময় আরেকটি সূর্য উদয় হচ্ছে। তাকে ঘিরে রয়েছে লাল হলুদ সাদা মিশ্রিত লাখ লাখ আলোক রশ্মি; যেন কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা দুনিয়াকে ভাসিয়ে দিবে। একদিকে তাকিয়ে মনে চরম ভয় অনুভূত হল অপর দিকে তাকিয়ে আশার সঞ্চার হয়েছে। দৃশ্যটা কেমন অদ্ভুত! এ দৃশ্য তো কখনো সে দেখেনি।
হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর বুঝতে পারল এতক্ষণ যা ঘটছে সবই স্বপ্নে হয়েছে। বাস্তবে নয়। সজল হাদীসে পড়েছে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। তাই স্বপ্নের একটা আলাদা গুরুত্ব আছে তার কাছে, যদিও সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও এই ব্যাপারে সামান্যতম জ্ঞান রাখে না।

তারপরেও স্বপ্নের অদ্ভুৎ ব্যাপারটি তার কাছে খোলাসা হতে বেশি সময় লাগেনি।

গোসল করে ফ্রেশ হতে হতে সজল জোহরের আজান শুনতে পায়। রেডি হয়ে সেদিন একটু আগেই মসজিদের দিকে ছুটে চলে সে। মসজিদে গিয়ে দেখে মুসল্লি হিসাবে কেবল একজনই বসে আছে এক কোণায়। কাছে গিয়ে দেখে আশরাফ বসে বসে কী যেন পড়ছে।
গতকাল সজল আশ্রাফকে কোরানের কয়েকটি সূরা অর্থ সহ বুঝে বুঝে পড়ার জন্য কাজ দিয়েছিল। মসজিদে বসে মনমত কোরান পড়া যায় এই ভেবে আশরাফ মসজিদে সেই সকাল দশটা থেকে কোরান পড়ছে। এখন তার নির্ধারিত পড়া প্রায় শেষ। মনে মনে ভাবছে আরো কিছু সূরা সম্পর্কে সজলের কাছ থেকে জেনে নিবে। এই ভেবে ঘাড় ফিরাতেই দেখে তার পিছনে সজল দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই সজল তার কিছুক্ষণ আগে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিনের আলোর মত দেখতে পেলেন। একটি মুচকি হাসি দিয়ে সজল দু রাকাত তাহিয়্যাতুল অজু পড়ার জন্য আল্লাহু আকবার বলে হাত বাঁধলেন। আশরাফ এদিক দিয়ে ‘সদাকাল্লাহুল আজিম’ পড়ে তাকিয়ে রইলেন সজলের নামাজ পড়ার দিকে।

.

রনি এখন থানায়। এই খবর শুনেই রনির বাবা স্ট্রুক করেছে। কেন কী কারণে পুলিশ তাকে আটক করেছে এ নিয়ে সঠিক কোন তথ্য গ্রামবাসী কারোরই জানা নেই। রনির বড় ভাইও জানে না। শুধু থানায় আছে এই খবর শুনে পাগলের মত ছুটে গেছে ঢাকার শাহবাগ থানার দিকে। এদিকে রনির দুই নম্বর ভাই তাদের বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করায়। বিপদ যখন আসে তখন চারদিক থেকেই আসে। গ্রামবাসীরা সঠিক তথ্য না জানলেও চা স্টল দোকান বাজারে আলাপ আলোচনার

মাত্রা চরম পর্যায়ে চলে গেছে। কেউ বলছে, উমুকের ছেলে রনি- এই যে কয়দিন আগেই তো আমাগো স্কুল থেকে পাস করে ঢাকায় পড়তে গেছিল- সে নাকি এখন সন্ত্রাসী করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। আবার পত্র-পত্রিকা পড়ুয়া চা পান কারীরা আফসোস করে বলছে, 'ইস ছেলেটা কত মেধাবী ছিল!' ঢাকায় গিয়ে এভাবে নষ্ট হয়ে গেল। কেউ আবার সমবেদনার স্বরে বলাবলি করছে, আমরা কত আশা করছিলাম যে আমাদের বাড়ির একটা ছেলে ভাল কিছু করবে কিন্তু----।

রনির বড় ভাই সোজা গাড়ি থেকে নেমে শাহবাগ থানার দিকে হাটছে। জীবনে কোন দিন ঢাকায় আসেনি। রনির ভাবি একদিন আবদার করে তার স্বামীকে বলেছিল, 'তোমার ভাই যেখানে পড়ে আমি শুনেছি ওখানে নাকি অনেক মানুষ, অনেক সুন্দর জায়গা; চলনা আমরা একদিন ঘুরে আসি। আর আমরা তো কোন দিন ঢাকায়ও যাইনি, এই সুযোগে ঢাকাটাও একবার দেখা হয়ে গেল।' বউয়ের কথায় রনির বড় ভাই ভেবে রেখেছিল রনি যেদিন পড়াশোনা শেষ করবে সে সময় কোন একদিন সুযোগ করে তার বউ পুলারে নিয়ে ঘুরে আসবে। কিন্তু রনির ভাই যে রনিকে জেল হাজতে এসে দেখতে হবে সেই কথা মনে হয় এখনও তার কাছে স্বপ্নের চেয়ে অবাস্তব মনে হচ্ছে। থানার গেইট অতিক্রম করার সময় বিশ পঁচিশজন ছেলে-পেলে দেখতে পেল। থানার ভিতর একজন পুলিশকে জিগ্যাসা করে ভিতরে গেল রনির বড় ভাই। শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে রনি। ভিতরটা অন্ধকার। হালকা হালকা দেখা যাচ্ছে। বড় ভাইকে দেখে রনির খুব লজ্জা হচ্ছে। মাথাটা দুই ধাক্কা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলতে মন চাচ্ছে। বড় ভাইয়ের নিষ্পাপ চোখ দুটো দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। সেই সকাল থেকে পেটে কিছু দেয়ার সময় হয়নি তার। ছোট ভাইয়ের কী অপরাধ! সে তো কোন দিন কোনধরণের অন্যায় করেনি। পাড়ার ছেলেরা কত অন্যায় কাজই তো করত। কিন্তু রনি! কোন দিন কারোর মুখ থেকে কোন কথা শুনতে হয়নি অভিভাবক হিসাবে তার। আজ কেন তাকে পুলিশ থানায় নিয়ে আসল? নানা প্রশ্নে তার মন ধীরে

ধীরে বিষিয়ে উঠছে। শুধু এক পলকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে রনির বড় ভাই বাহিরে চলে এল। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সাহস করল না; মনে হল মাথা ঘুরিয়ে এখনই পরে যাবে। গ্রামের অবুঝ কৃষক; মামলা মোকদ্দমা থানা-জেল হাজতের ব্যাপার, এ জ্ঞান তার শূন্যের কোটায়। পাড়া-প্রতিবেশীর চাচা-জেঠাদের জমি নিয়ে মারামারীর জের ধরে মামলার কথা কানে শুনেছিল ছোট বেলায় কিন্তু কিছুই বুঝেনি। আজ নিজের আপন ভাই আছে থানায়। কী করবে এখন তার মাথায় কিছুই আসছে না। থানা থেকে যদি তাকে ফোন না দিত হয়ত সে জানতেও পারত না যে তার ছোট ভাই হাজতে আছে।

থানার গেইট থেকে বের হওয়ার সময় জটলা পাকানো ছেলেদের কাছ দিয়ে যখন রনির বড় ভাই যাচ্ছিল তখন রনির সম্পর্কেই তারা আলাপ করছিল মনে হয়েছে। আরেকটু কাছে গিয়ে বুঝল ঠিকই রনি সম্পর্কেই তারা আলাপ করছে। তাদের এলোপাতারি আলাপ একটু কান পেতে শুনার পর রনির বড় ভাই যা বুঝল তা বুঝার জন্য সে কোনভাবেই প্রস্তুত ছিল না।

প্রতিদিনের মত রনি সেদিনও শাহবাগে শিশুপার্কের সামনে থেকে কার্টুনের ভিতরে থাকা বোতলজাত পণ্য বহন করার জন্য হল থেকে রিক্সায় চেপে জটপট বেগে রওয়ানা হয়েছিল। কাজটি প্রতিদিনের মত হলেও সময়টি প্রতিদিনের মত ছিল না। ঘটনার পরের দিন ছিল বিরোধী দলের হরতাল। তাই আইন শৃংখলা বাহিনীর তৎপরতা স্বাভাবিক ভাবেই আগের রাতে এই একটু বেশ কঠিন ছিল। নিয়মিত টহল পুলিশ ছাড়াও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাড়তি টহল নামানো হয়েছে। নিয়মিত যারা টহল দেয় তাদের সাথে রনির চোখোচোখী পরিচয় হয়ে গেছে এতদিনে। কিন্তু আজ যেহেতু পরিবেশ একটু ভিন্ন তাই ঘটনা ভিন্ন দিকেই গড়াল। রনি জানত আজ বাহিরের পরিবেশ ভালনা। কিন্তু রনির তো কিছু করার

নেই। রনি তো কেবল বহনকারী। মূল ব্যবসা তো করে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রনেতা হলের সভাপতি তথা রনিকে আশ্রয়দাতা মহৎ ব্যক্তিটি। তবে রনির একটা বিশ্বাস ছিল হল সভাপতির প্রভাব প্রতিপত্তির ব্যাপারে। বিশ্বাসের কিছু ফল আছে। রনির এই ছোট্ট তবে সংগ্রামী জীবনে বহুমানুষকেই বিশ্বাস করতে হয়েছে। বিশ্বাস না করলে এতদূর পর্যন্ত হয়ত আসতে পারত না সে। যাইহোক, অবশেষে ডিবি পুলিশের হাতে ধরা খেয়ে গেল রনি। তাই বোতলজাত পণ্য নিয়ে হলে না গিয়ে আজ থানায় যেতে হল। তবে ভাগ্য ভাল ডিবি পুলিশের হাতে ধরা খেয়ে যে থানায় আসতে পেরেছে। যদি কোনভাবে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যেত তাকে হয়ত বাড়িতে খবর যাওয়া তো দূরে থাক, কোন কাক পক্ষীও জানতে পারত না।

হল গেইটে জটলা পাকানো ছেলেদের মাঝে গিয়ে অবুঝ শিশুর মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ভাঙ্গা গলায় বলতে শুরু করল, ‘আমার ছোট ভাই কি ছাড়া পাইব ভাই? সে তো কোনদিন কোন খারাপ কাম করে নাই ভাই। ওরে কেন পুলিশে ধরে নিয়ে আসল?’ রনির বড় ভায়ের গড়াগড়ি দেয়া অবস্থা দেখে একটা ছেলের মনে অনুকম্পা হল। সে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করল নানা ভাবে এবং অভয় দিল যতক্ষণ সম্ভব। হঠাৎ একটা মটর সাইকেল থানার গেইটের সামনে এসে থামল। মটরসাইকেলটি থামতেই ছেলেগুলো হরহর করে মটর সাইকেল আরোহীর সাথে হ্যান্ডশেইক করতে লাগল। তিনিই রনির নিয়োগকর্তা হলের সভাপতি। ছেলেদের একজন রনির বড় ভাইয়ের দিকে সভাপতিকে ইঙ্গিত দিয়ে দিল। সভাপতি বড় ভাইয়ের কাছে এস গমগম কন্ঠে বলল, অ আপনি রনির বড় ভাই? একটু নিচু গলায় বড় ভাই উত্তর দিল,
: হ্যাঁ ভাই। আচ্ছা ভাই, আমার ভাই কি ছাড়া পাইব?
সভাপতি একটু বিরক্ত ভাব প্রকাশ করে বলল,

: আপনি বাড়ি গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমান। একটু পরই ছাড়া পাইয়া যাইব। এই বলেই সে থানার ভিতরে ঢুকে গেল। রনি একদিন থানায় থাকলে সভাপতির একদিনের ব্যবসা রসাতলে যাবে। যত দ্রুত সম্ভব তাকে ছাড়ানো যায় ততই ভাল। রনির পরিবারের চেয়ে সভাপতির পরিবারের প্রয়োজনীয়তাই এখন বেশি। রনির বড় ভাই নিরুপায় হয়ে উল্টা দিকে রওয়ানা হল। ঢাকাতে থাকার মত কোন পরিচিত আত্মীয়ের বাড়ি নেই। তাই এখন বাড়ি যাওয়াটাই শ্রেয়। শেষবারের মত রনিকে দেখার জন্য মন চাচিছল বড় ভাইয়ের কিন্তু আবার একরাশ জেদ তাকে দেখতে যেতে বাধা দিচ্ছিল। এত আশা নিয়ে বসে আছে কত কষ্ট করে তাকে টাকা জোগাড় করে দেয় পড়াশোনা করার জন্য। কিন্তু সে কিনা পড়াশোনা না করে এই কাম করে বেড়ায়। তারপরও ভাইয়ের প্রতি মমতাবোধ তাকে এত নিষ্ঠুর হতে দেয় নি যে, শেষবারের মত ভাইকে না দেখে থানায় রেখে বাড়ি চলে যাবে। বরং সে শেষ বারের মত তার ছোট ভাই তথা রনিকে দেখে আসল। এবার আর তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে না। রনি তার ভাইকে কী যেন বলতে চেয়েছিল কিন্তু বড় ভাই রনিকে সেই সুযোগ না দিয়ে সোজা থানা থেকে বের হয়ে আসল।

দুইদিন পর রনি থানা হাজত থেকে মুক্তি পেল। মুক্তি পেয়েছে ঠিক কিন্তু ঘটল আরেক কাণ্ড। এদিক দিয়ে জাতীয় পত্রিকা সহ কয়েকশ অনলাইন পত্রিকায় নিউজ হয়ে গেছে রনির বোতলজাত পণ্য আমদানীর ব্যাপারটা নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রসাশন কি আর বসে থাকতে পারে? এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু তো যেন-তেন করে ছেড়ে দেয়া যায় না। যদিও এটার মূল আসামী হল সভাপতি কিন্তু সভাপতির ছাত্রত্ব তো শেষ আরো দু বছর আগে। তাই এখন রনিকেই সব বহন করতে হবে। রনির শাস্তি হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দুবছরের জন্য বহিস্কার ঘোষণা করেছে। রনির মস্তিষ্ক এখন পাথরের মত হয়ে গেছে। তার শরীরের রক্ত মাংস শুকিয়ে কুলে ভেসে আসা শৈবালের মত অবস্থা। কোন ব্যাথা তার কাছে

ব্যাথা মনে হয় না। কোন শাস্তি তার কাছে কঠিন অনুভূত হয় না। অনুভূতির সামান্যতরও তার মধ্যে বিদ্যমান নেই। যাহোক, হল সভাপতির সহযোগিতায় রনির শাস্তি দু বছর থেকে একবছরে নেমে এসেছে।

রনি এখন আরো নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। আগের মত পড়াশোনা করার চিন্তু মাথায় আসে না। হঠাৎ তার মনটা কেমন যেন করছিল। সে জানে না বাবা তার থানা হাজতের কথা শুনে স্ট্রুক করেছিল। তার বাবা এখন কোন কথা বলতে পারে না। জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে সেতু পার হয়ে ওপারে চলে যেতে পারে। রনির বড় ভাইও রনিকে ব্যাপারটি ইচ্ছা করে জানায়নি। কারণ রনি বাড়ি গেলে এলাকার লোকজনের সমালোচনা যেমন তুঙ্গে উঠবে তেমনি তার অসুস্থ বাবা তাকে দেখলে আরো অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে রনির বাবা। সব স্বজনরা পাশে বসে আছে। সবাই কোন একটি সংবাদের অপেক্ষা করছে। সবাই আছে কিন্তু সবার আশার কেন্দ্রবিন্দু রনি আজ পাশে নেই। রনিকে তার ভাই খবর দেয়নি ঠিকই কিন্তু এই অবস্থায় অনেক স্বজনই ফোন করে তার বাবার অবস্থা জানিয়েছে। এখন তার মোবাইল বন্ধ। প্রথম ফোন কল পেয়েই তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। তারপর কোনরকম রেডি হয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছে সে। পথিমধ্যে হয়ত আবার নতুন আরেকটি সংবাদ তার জন্য প্রস্তুত ছিল; কিন্তু রনির মোবাইল তো বন্ধ।
উপজেলা হাসপাতাল থেকে ততক্ষণে বাড়ির দিকে এম্বুল্যান্স চলতে শুরু করেছে। ভিতরে আছে একটি লাশ; যে কিছুক্ষণ পূর্বে রনির বাবা হিসাবে পরিচিত ছিল। এখন তার সাথে কেউ সম্বন্ধ করতে নারাজ। তার নামও পরিবর্তন হয়ে একটি কমন নাম হয়েছে; সবাই বলে- লাশ। আচ্ছা

যাহোক, মৃত দেহটির সাথে আছে রনির বড় ভাই সহ দুই তিন জন স্বজন। হাসপাতালে গিয়ে জানতে পারল যে, তার বাবা ঘন্টা খানেক আগে মৃত্যুবরণ করেছে আর এই মাত্র এম্বুল্যান্স তাকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছে। বোধহীন রনি যেন নিক্ষিপ্ত পাথরের মত গড়িয়ে পড়তে লাগল; যেটি আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত হয় আর সমুদ্রের অতল গহ্বরে গিয়ে ডুবে যায়। আবার বাড়ির দিকে ছুটল রনি। মোবাইল বন্ধ এটা নিয়েও রনির কয়েকজন আত্মীয় নানান চিন্তার ফলশ্রুতিতে নানান কমেন্ট করতে লাগল। সবাই আসছে কিন্তু রনি নেই; তার কোন খোঁজও পাওয়া যাচ্ছে না। নতুন কোন স্বজন আসলে সবাই রনি আসছে মনে করে দরজার দিকে তাকায়। আবার হতাশ হয়।

সবার হতাশাকে ভেঙ্গে দিয়ে আশার আলো নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে রনি। মরাবাড়ি সাধারণত যেমন কান্নাভরা কণ্ঠে ভরপুর হয়ে পরিবেশ ভারী হয়ে থাকে, রনির বাড়ির অবস্থাও অনুরূপ। রনিকে জড়িয়ে তার ফুফু চাচীরা বিলাপ করতে লাগল। রনির চোখে কোন কান্না নেই। শুধু জিদ-রাগ-ক্ষোভ। বাড়িতে আসার পথে তার ছোটবেলার এক বন্ধুর সাথে দেখা হয়। বাড়ির পাশে বাড়ি হওয়ায় তার বাবার সব অবস্থাই সে সবিস্তারে জানে। থানা হাজতের ঘটনা শুনার পর তার বাবা স্ট্রুক করে আর তারপরই মৃত্যুর ঘটনা। এটা জানার পর রনির কাছে মনে হয়েছিল যদি সে এখন মাটির মধ্যে ঢুকে যেতে পারত। গ্রামের সব মানুষের মুখেই এখন এটি; রনির জন্যই ওর বাবা আজ মরেছে। না হয় বেচারা আরো দু একবছর বাঁচতে পারত। ইত্যাদি ইত্যাদি। মরার আগে নাকি রনির কথা মুখে উচ্চারণ করেছিল কিন্তু কি যেন বলছে কিছু বুঝা যায়নি। রনি তার বাবার সাথে শেষ বারের মত কিছু বলতে পারে নি। মা মৃত্যুবরণ করছিল তার ছোট অবস্থায়। মায়ের সোহাগ স্নেহ পায়নি। কিন্তু বাবাকে রনি অক্ষরে অক্ষরে বুকে ধারণ করেছিল। বাবার অসহায়ত্ব আর কষ্টের কথা মাথায় রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল সে। কিন্তু সেই বাবাই আজ

তার কর্মের কারণে দুনিয়া ছেড়েছে। এর চেয়ে অপমানজনক ব্যাপার আর কি আছে একজন সন্তানের জন্য।
পরিবারের সবচেয়ে আপনজন ও কাছের ভাই ও ভাবিরা কেউ রনির সাথে তেমন কথা বলছেনা। বিশেষ করে রনির বড় ভাই যে তাকে সবসময় ছায়ার মত করে বড় করেছে সেও যখন রনির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে তখন তার কাছে মনে হয়েছে যে, তার জন্য আত্মহত্যা করাই যেন সবচেয়ে সুন্দর সিদ্ধান্ত। সবার দৃষ্টি এখন রনির ভুলের দিকে। দুদিন থেকে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওয়ানা হয় রনি। নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।

গত আট-দশ দিন ধরে রনি হল সভাপতির চাকুরি করছে না। সহজ কথায়, বাবার মৃত্যুতে দুসপ্তাহের ছুটিতে আছে। রনির কাছে ব্যাপারটি এখন খুবই শুধু ঘৃণ্যই মনে হচ্ছে না বরং হিংস্রও মনে হচ্ছে। কারণ এটাকে কেন্দ্র করে কত কিছুই না হয়ে গেল। তার জীবন আজ কোন পর্যায়ে? উত্তরবিহীন মনে হাজারও প্রশ্নপত্র উড়ে বেড়ায়। প্রতিটি প্রশ্ন মনের ভিতরে গিয়ে হতাশার জাল বুনন করে চলছে। এই জালে আটকে পড়ছে সকল আশার উপাদান।

.

রনির বন্ধু বড় ভাই যারা নেশা করে তাদের কাছ থেকে একসময় শুনত- মানুষ যখন কোন কিছুর সমাধান খুঁজে পায় না, তার সামনে যখন আর কোন পথ থাকে না তখন সবচেয়ে আপন হিসাবে যাকে পাওয়া যায় সে হল ঐ বোতলজাত পণ্য। এই বোতলজাত পণ্যের জন্যই তো আজ তার জীবনের দূরাবস্থা। এই আপন সত্তাটির সাথে তার এত চেনা পরিচয় থাকা সত্ত্বেও সে যে এত আপন, বিপদে আপদে এত কাছে থেকে সহযোগিতা করে এটা কখনো টের পায়নি রনি।
দুই সপ্তাহের পর আজ থেকে রনির চাকুরি শুরু হচ্ছে আবার। সভাপতির রুমে এসে কার্টুন টেবিলের উপর রেখে অন্যদিনের মত সভাপতিকে

একটা বোতল ধরিয়ে দেয়। অপেক্ষমাণ সভাপতি ততক্ষণাৎ গ্লাসটা হাতে নিয়ে গড়গড় করে এক গ্লাস গলাধঃকরণ করে নিল। এবার রনি কার্টুন থেকে আরেকটা বোতল বের করল। সভাপতি লাল চোখে ভাঙ্গা গলায় বলল,

: কিরে কার জন্য এটা?

রনি: আমার জন্য।

সভাপতি: কবে থেকে?

রনি: আজ থেকেই।

সভাপতি: আচ্ছা। তাহলে টাকা দে। রনি ভাবছিল তার জন্য হয়ত ফ্রি। কিন্তু না। ফ্রি না হলেও ফ্রি করার মৌখিক একটা দরখাস্ত করার জন্য রনি কিছু বলতে চাইল। কারণ, ইতিপূর্বে ফ্রি করার জন্য বহু দরখাস্ত এপ্লিকেশন তাকে করতে হয়েছে। স্কুলে কলেজে। সব জায়গায়ই তার দরখাস্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আজ----। রনির মুখের কথা থামিয়ে দিয়ে সভাপতি বলল,

: শালা, এটা আমার ব্যবসায়। আর ব্যবসার মূলধন হল প্রতিটা বোতল। ব্যবসার মধ্যে মূলধন হল সবচেয়ে পবিত্র জিনিস। পবিত্র এই জিনিসে কারোর ফ্রি ভাগ রাখতে নাই।

রনি: ভাই, আমার কাছে তো এখন কোন টাকা নেই।

সভাপতি: আচ্ছা, এখন টাকা লাগবে না। তোর মাসিক পেমেন্ট থেকে টাকা কেটে রেখে দিব।

রনি হিসাব করে দেখল সে যত টাকা মাসে তার চাকুরির বিনিময়ে পায় যদি সে প্রতিদিন একটি করে বোতল আস্বাদন করে তাহলে তাকে বেতনের ডবল ব্যয় করতে হবে। আরে! প্রতিদিন কি আর সে এসব খাবে নাকি? তাই কোন সমস্যা নেই। সভাপতিকে এতক্ষণ তার গলার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল নেশাগ্রস্থ কিন্তু মাত্র যে ব্যবসার হিসাবটা কষল এটা তো সুস্থ মানুষও করতে পারে না। রনি জ্বি ভাই বলে সম্মতি জানিয়ে কার্টুন থেকে একটা বোতল হাতে সভাপতির রুম থেকে বের হয়ে গেল।

একটা প্রশান্ত মন নিয়ে রনি তার রুমের দিকে হাটছে। তার বিশ্বাস সকল হতাশার একটা সমাধান হবে আজ থেকে। কারণ বিশ্বাসের একটা ফল তো আছেই।

.

ইয়ার ড্রপ, বহিস্কারের ভিড়ে রনি এখন কোন ইয়ারের ছাত্র এটা বুঝা না গেলেও হলের মধ্যে সে সেকেন্ড ইয়ারের শেষ দিকে আছে। সেকেন্ড ইয়ার মানেই ক্ষিপ্র কিছু একটা বুঝায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্যাম্পাসের সবচেয়ে পাওয়ারফুল মোডে থাকে সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্ররা। প্রথম বর্ষে থাকার সময় নিজে অনেক মারামারিতে কর্মী হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু এখন কয়েকধাপ প্রমোশন নিয়ে এসব মারামারিতে নেতৃত্ব দেয়। নিজের হাত লাগাতে হয় না। তার কথায় প্রথম বর্ষের তিরিশ চল্লিশ জন ছাত্র উঠে বসে। যে কোন ঝামেলায় ফোন করলে ছেলেরা মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এক সপ্তাহ আগের ঘটনা। রনি গিয়েছে নীলক্ষেতে তার বন্ধুর সাথে। রনির বন্ধু একটি বই কিনবে। দোকানদারের সাথে দরকাষির এক পর্যায়ে রনি ও তার বন্ধু তর্কে লিপ্ত হয়ে গেল। বন্ধু ব্যাপারটাকে এড়িয়ে ফিরে আসতে চাইছিল। কিন্তু রনি ক্রমেই ক্ষিপ্র হয়ে উঠল। দোকানদারও চাচ্ছিল ব্যাপারটা আর সামনে না বাড়ুক। এর মধ্যেই রনির বাম হাতটা দোকানদারের ডান কানের নিচ দিয়ে চালিয়ে দিল। নীলক্ষেতে শত শত দোকান। দোকানদারদের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট মিল সম্প্রীতি। এমন অপ্রীতিকর পরিস্থিতিকে প্রতিরোধ করার জন্যই তারা এমন বন্ধনে থাকেন। তো, দোকানদার কি আর বসে আছে? ধপাস ধপাস করে ঘাড়ের দু পাশে দুটা বসিয়ে দিল। আসলে রনির গায়ে যত না জোড় তার চেয়ে বেশি জোড় মনে। আর সবচেয়ে বেশি জোড় ফার্স্টইয়ারের জুনিয়রদের কাছে জমা করা আছে। তাই আর কাজ না বাড়িয়ে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে ফার্স্ট ইয়ারের কয়েকজনকে কল করে দিল-

‘সবাইকে নিয়ে এখনই নীলক্ষেত আয়, ঝামেলা হইছে। মুহূর্তের মধ্যে ছেলে পেলে হর হর করে নীলক্ষেতে উপস্থিত। তিরিশ চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে দশ পনেরটা দোকান তছনছ করে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করল রনি ও তার অনুগত ফার্স্ট ইয়ার বাহিনী। রনির জেদ যখন স্বাভাবিক হল তখন সবাইকে হলে ফিরত যেতে ইঙ্গিত দিল। আবার হর হর করে মার্কেটের ভিতর থেকে বের হয়ে যাবে এমনই হয়ত ভাবছিল রনির বাহিনী। রনি দেখল মার্কেটের গেইট আটকানো আর লাঠি-রড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দোকানদাররা। এবার তাদের আসল রূপ প্রকাশ পেল। ছেলে পেলেরা দৌড়াদৌড়ি করে অনেকে অনেকদিক দিয়ে পালাতে সক্ষম হলেও ফার্স্ট ইয়ারের দুইটা ছেলেকে দোকানদাররা ধরে ফেলে। এই দুইজনকেই দশ-পনের জন আচ্ছামত মারধর করল। দুজনের একজনের অবস্থা অনেক শোচনীয় হয়েছিল। ঢাকা মেডিকেলে দুদিন ছিল। পরে মেডিকেল থেকেই সোজা বাড়ি চলে যায়। আর কোন দিন হলের ধারে কাছেও আসেনি সে। একদিন তার ডিপার্টমেন্টের বন্ধু থেকে রনি শুনেছিল ছেলেটা একপর্যায়ে দেশেও থাকেনি; স্কলারশিপ নিয়ে ইউরোপ কান্ট্রিতে চলে গেছে।

.

হলে যেসব ছেলেরা থাকে তাদের অনেকে এত ব্যস্ত থাকে যে মেয়েদের সাথে বেশি উঠা-বসা করার সুযোগ হয়ে উঠে না। আর রনির মত যারা আছে তাদের কথা তো আর বলতেই হয় না। তারপরেও এই কয়দিন রনির মনটা উতাল-পাতাল করছিল। গতসপ্তাহের ঘটনা। কী কাজে যেন ডিপার্টমেন্টে যেতে হয়েছিল। কাজ সূত্রে অফিসে দেখা হয় সদ্য আসা প্রথম বর্ষের এক মেয়ের সাথে। তাকে দেখে রনির পবিত্র আত্মাটা লাফিয়ে উঠে। জেগে উঠে অনেকদিন থেকে মৃত হৃদয়টা। তখন কিছু বলতে না পারলেও মনে মনে একটা সংকল্প করে আসে ‘ডিপার্টমেন্ট থেকে আর কিছু না নিতে পারলেও তাকে নিয়ে যাব।’ তারপর থেকে

রনিকে ডিপার্টমেন্টে প্রতিদিনই আসতে হত অন্তত তাকে একনজর দেখার জন্য। স্কুল জীবনে একবার রনির এমন ভাল লাগা কাজ করেছিল। কিন্তু সেটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল, কারণ রনি যেদিন ঐ মেয়েকে ভাললাগার কথাটা বলবে বলে ভাবছিল তার এক সপ্তাহ পরেই এক বিদেশী নেশাখোরের কাছে বিয়ে হয়ে যায়। রনি পরে শুনেছিল, ঐ মেয়েকে বিয়ে করার পর তার কেবল মায়াবী চাহনীর দিকে তাকিয়ে নাকি ছেলেটা নেশা ছেড়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিদেশও যায়নি তাকে ছেড়ে, দেশেই ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেছে। ঐটা হাতছাড়া হয়েছিল, এটাকে কোনভাবেই হাতছাড়া করা যাবেনা। কী হরিণীর মত তার দুটো চোখ! দশপনের দিন ধরে রনি ডিপার্টমেন্টে আসছে; কেবল ঐ মেয়েটাকে দেখার জন্যই। অথচ এতদিনে তার সাথে কথা তো দূরে থাক তার নাম পর্যন্ত জানা হয়নি। অবশেষে নিরুপায় হয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে রনি তার হলের একটা জুনিয়রের মাধ্যমে তার নাম জানার সুযোগ পায়; হলের জুনিয়র ভাইটি ঐ মেয়েটির ব্যাচমেট।

এখন থেকে রনি জুনিয়র ভাইটিকে দিয়ে মেয়ের সাথে কথা বলার চিন্তা করে। অনেক চেষ্টা তদবির করে একদিন মেয়েটির সাথে কথা বলার সুযোগ পায়। দুই তিন মিনিট কথা বলে বাস চলে যাবে অজুহাত দিয়ে রনির কাছ থেকে বিদায় নেয় মেয়েটি। ডিপার্টমেন্টের বড় ভাই চাইলেই সহজে এভয়েড করে চলা যায় না। রনি দুদিন থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মেয়েটির সাথে কথা বলে। মেয়েটি তার ব্যাচমেট বন্ধুকে রনি সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে। সে যাহা সত্য তাহাই বলে দিয়েছে; কোন কিছুই গোপন করেনি। তারপরও মেয়েটি প্রথম বর্ষের পড়ে; তাই রনিকে কিছু বলতেও পারে না। বরং যাহা জিজ্ঞাস করে সবকিছুই লক্ষী মেয়ের মত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় উত্তর দেয়। এতে রনির ভাললাগা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর মেয়েটির মনে বৃদ্ধি পায় বিরক্তিভাব। যাহোক, এমন ভাললাগার ফলাফল তাহলে কোনদিকে যাবে সেটা রনি সময়মত টের পেয়েছিল; যেদিন দেখেছিল রাত আটটার পর মেয়েটি

বটতলায় আরেকটি ছেলের কোলে মাথা রেখে বাদাম খাচ্ছিল। রনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলনা বিষয়টি। সে মনকে বারবার বুঝানোর চেষ্টা করেছে যে- নাহ মেয়েটি এমন করতে পারেনা; হয়ত সে ছেলেটি তার ভাই বা মামা হতে পারে। তারপরও বাস্তবতাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। রনি সেদিন ঐ ঘটনাটি তার মনকে বিশ্বাস করাতে বোতলজাত দ্রব্য ডবল করে সেবন করতে হয়েছিল।

গত একমাস ধরে রনির অর্থনৈতিক অবস্থা খুব মন্দা যাচ্ছে। দুতিনটা পেশায় যুক্ত হয়েও তার খরচের প্রবাহকে ঠিক রাখতে পারছেনা। সভাপতির কাছে বলল, 'ভাই খাবারের টাকা তো এখন ম্যানেজ করতে পারিনা।' অন্যান্য ব্যয় বেড়ে গেছে অনেক। সভাপতি রনির কোন কথাতেই এখন না বলেনা। সবসময়ই একটা সমাধান দিয়ে থাকে। আর এটা তো সহজ বিষয়। হলের ক্যান্টিনে লাখ লাখ টাকার ব্যবসা করে ক্যান্টিনের মালিকেরা। এখান থেকে দুই-চার-পাঁচটা ছেলেকে ফ্রি খাওয়ানো কোন ব্যাপার হল! এটাতো তাদের নৈতিক দায়িত্বও বটে। বিপদে আপদে পলিটিক্যাল ছেলেরাই তো এগিয়ে আসে। আসলে কোন ক্যান্টিনের মালিক এ যাবৎ কোন বিপদে বা ঝামেলায় পতিত হয়েছে আর হলের পলিটিকেল ছেলেরা সেটা সমাধান করেছে সে ইতিহাস না থাকলেও পলিটিকেল ছেলেদের কারণে কত ক্যান্টিনের মালিক যে দেউলিয়া হয়ে পথের ভিখারী প্রায় হয়েছেন সেই নজির ভুরি ভুরি। যাহোক, রনির জন্য পরদিন সকাল থেকে ক্যান্টিনে ফ্রি খাওয়া বন্দোবস্ত হয়েছে এটাই সবচেয়ে বড় কথা তার জন্য।

নয়নের বাবা কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েছে দশ-পনের দিন হল। সজল খবরটি শুনতে পেয়ে নয়নের সাথে তার বাড়িতে যাওয়ার মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করল; নয়নের বাবাকে একনজর দেখে আসবে এবং তার মায়ের

সাথে দু চারটি সান্ত্বনামূলক কথাবার্তা বলবে। কিন্তু তার বাবা কারাগারে যাওয়ার পর থেকে নয়নের সাথে সজলের সম্পর্ক এতই খারাপ হয়েছে যে নয়ন সজলকে কখনোই চোখের সামনে দেখতে চাইতনা। সর্বদাই এড়িয়ে এড়িয়ে চলত। আর কখনো দেখা বা কথা হয়ে গেলে বিরক্তি ভাব নিয়ে বিদায় হত। এই করুণ সম্পর্ক সজলকে সর্বদাই পীড়া দিত। তারপরেও সজলকে ধৈর্যশীল থাকতে হবে এই ভেবে সদা হাসি মুখে কথা বলে নয়নের সাথে।

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নয়ন তার বাবাকে দেখতে যায়। শত হলেও তার তো বাবা। কয়দিন আর রাগ-গোস্বা করে থাকা যায়। কিন্তু বাড়ি যাওয়ার পর তার কোন আত্মীয় স্বজন আসার আগেই নয়ন দেখে তার বাবার রাজনৈতিক বন্ধুরা বাড়িতে এসে হাজির। তাদেরকে দেখে নয়নের মাথা আবার আগের অবস্থানে চলে আসে। বাবা-মায়ের প্রতি তার নতুন করে ক্ষোভের দানা বাঁধতে শুরু করে। আর তার বাবার মুখেও কোন কষ্ট-কান্না-বেদনা-যাতনা ইত্যাদির ছাপ বিন্দু মাত্রও লক্ষ করা যাচ্ছে না। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মাত্র দুই ঘন্টা হল বাড়িতে এসেছে। তন্মধ্যে এক ঘন্টার মাথায় নয়নও বাড়ি পৌঁছায়। বাড়ি এসে যখন দেখে তার বাবা স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, তার বাবা সামান্য কিছু খেয়ে আবার রাজনৈতিক একটা মিটিং এ উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এসব কাণ্ড দেখে নয়ন মনে মনে ভাবছিলেন, ‘কোন একটি আদর্শের কাছে মানুষ এভাবেই নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারে! বুঝলাম সে তার আদর্শের কাছে সবকিছু উৎসর্গ করে দিল ভাল কথা কিন্তু আমরা তো তার সন্তান তার তো সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবাও একটি দায়িত্ব। এই যে কারাগারে তিনি এতদিন ধরে বন্দি ছিলেন, আমাদের কি যে করুণ অবস্থাই না হয়েছে!’ নয়ন এসব চিন্তায় পুরো অস্থির হাঁপিয়ে উঠছিল আর ক্রমাগত তার ক্রোধের মাত্রা বেড়েই চলছিল। কিন্তু সে একবারের জন্য ভাবছেনা, তার বাবা তো কোন অন্যায় কাজ করে কারাগারে যায়নি। কোন দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, খুন-খারাবি

ইত্যাদি বা কোন ধরণের মন্দ কাজের দায়ে তাকে কারাগারে নেয়নি পুলিশ। বরং দেশ ও ধর্মের কল্যাণে কাজ করতে গিয়ে তাকে তার আদরের সন্তান, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজনকে ফেলে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিনাপাত করতে হয়েছে। এটা কি একজন আদর্শ ও সৎ মানুষের দায়িত্ব নয়? এই বিষয়গুলো একসময় নয়ন খুব ভালভাবেই অনুধাবন করতে পারত। কিন্তু এখন যেন তার মাথা এসব কথা শুনলে তিনটা চক্কর খায়। এই তো কারাগারে যাওয়ার পরপরই সজল কত সুন্দর করে বিষয়গুলো নয়নকে বুঝাল! আরে সজল কেন? স্বয়ং তার আপন মা ও বুঝানোর চেষ্টা করছিল।

নয়ন বাড়ি যাওয়ার পরপরই সজল দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, "হে আল্লাহ তুমি তাকে সঠিক বুঝ দান কর।" সজল মনে মনে আশা পোষছিল এবার বাড়ি গিয়ে তার বাবার সাথে কথা বলে বুঝি সে আবার আগের পথে ফিরে আসবে। তার রাগ-অভিমান সব দূরভিত হবে। আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখান না তাকে সঠিক পথ দেখানোর মত সামর্থ কারোর নেই। এই আয়াতটিও মনে হচ্ছিল সজলের সাথে সাথে।

বাড়ি থেকে ক্যাম্পাসে ফিরেছে নয়ন। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অনেকটা হতাশ হয়েই সে ফিরেছে। তার ভাবগতি আরো নেতিবাচক পর্যায়ে চলে গেছে। সজল সেটা নয়নের সাথে পাঁচমিনিট কথা বলার পরই অনুধাবন করতে পারল। যাহোক, কী আর করার? সজল শুধু আল্লাহর কাছে বলেই ক্ষান্ত হল।

ক্যাম্পাসে আসার পর দুই-তিন ধরে হল থেকে বের হয়না নয়ন। তাই তার বন্ধু বান্ধব সবাই তার জন্য অস্থির হয়ে আছে। কাছের কয়েকজন ফোন করে বলছে বের হওয়ার জন্য। অন্তত বিকালটাতো একটু কাটানো যায় বাহিরে। কিন্তু নয়নের কিছুই ভাল লাগছিলনা। সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা দিয়ে থার্ড ইয়ারে উঠেছে সবেমাত্র। তারপরেও দুই বছর কিভাবে যে কেটে গেল, কোন টেরই যেন পাওয়া গেলনা। কি করেছে সে এই দুই

বছরে? না পড়াশোনা, না অন্যকিছু। যা হয়েছে কেবল বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়েছে। এসব ভাবছে আর বাহিরে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আজ সেইরকম করে আড্ডা দিবে সে; দীর্ঘ দিন যাবৎ নানান চাপের মুখে তাকে আড্ডা কথাটি ভুলেই যেতে হয়েছিল। সুদে-আসলে তাকে সব আদায় করতে হবে।

বন্ধুদের সাথে দেখা হওয়া মাত্রই নয়নের মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে। ততক্ষণাৎ আবার তার বাবার কথা মনে পড়ে যায়। সাৎ করে তার হাসি মুখটা অমাবস্যার আধাঁরের মত কাল হয়ে গেল। বন্ধুরা কিছুই বুঝতে পারলনা। বুঝবেই বা কীভাবে; তার বাবা সম্পর্কে তো ক্যাম্পাসে সজলই জানে। তার অন্য বন্ধুরা যাদের সাথে সে নিয়মিত চলাফেরা করে তাদের কেউ জানেনা। নয়ন তার হাসিমুখ আবার ফিরত এনে বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মেতে উঠে।

আড্ডার ফাঁকে বন্ধুদের মধ্য থেকে একজনের গার্ল ফ্রেন্ড নিয়ে কথা উঠে। সে নাকি অনেক সুখে আছে। একই ডিপার্টমেন্টে পড়ে ওরা দুজন। একসাথে বসে। একসাথে গ্রুপ স্টাডি করে। এক সাথে খায়। একসাথে ঘুরতে যায়। আহ! কত আনন্দ হতে পারে বিষয়টা। ভাবতেই যেন এক যাদুকরী মধুর মিষ্টতায় ভরে উঠছে নয়নের মস্তিষ্ক। তার ভিতরে লুকিয়ে থাকা বিষন্ন মনটি উৎফুল্ল হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। দুই বছর পার হয়ে ক্যাম্পাস লাইফ তিন বছরে পা রেখেছে; এতদিন বিষয়টি এভাবে ভেবে দেখেনি নয়ন। কিন্তু আজ বন্ধুর গার্ল ফ্রেন্ড ও তাদের মধুর জীবন পদ্ধতির গল্প শুনে মনে হচ্ছিল সে এতদিন ভুল পথেই ছিল। তাকে অচিরেই সঠিক পথে এসে জীবনের চরম সুখ ও পাওয়াকে আদায় করে নিতে হবে। ডিপার্টমেন্টে কত মেয়েই তো নয়নের সাথে পড়ে। এই দুই বছরে কত মেয়ে তার সাথে ভাব জমাতে চেয়েছে কিন্তু নয়নের কাছে এসব বিষয়ের কোন গুরুত্বই পেত না বরং ঝামেলা মনে হত। প্রথম দিকে মনে করত, একমনে পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে এসব প্রেম টেম প্রধান বাঁধা হিসাবে জীবনে আবির্ভূত হয়। নয়ন তো এখনো ভুলে যায়নি তার সেই

বন্ধুর কথা যে তার সাথে একই স্কুলে পড়ত। ছেলেটা কত মেধাবী ছিল! কিন্ত হঠাৎ নবম শ্রেণীতে উঠার পর কোন এক মেয়েকে তার ভাল লেগে যায়। ঐ মেয়ের পিছনে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এস.এস.সি পরীক্ষাটাও দিতে পারলনা। পরে শুনা গেছে ছেলেটি নাকি বিদেশ চলে গেছে।
কিন্তু জীবনের এ পর্যায়ে এসে নয়নের কাছে মনে হচ্ছে, তাকে একটি প্রেম করতেই হবে; অন্যথায় তার জীবন অপূর্ণ থেকে যাবে। সেদিনের আড্ডার আলোচ্য বিষয় ছিল তাদের এক বন্ধুর প্রেম জীবন। আর আড্ডার ফলাফল ছিল, নয়য়ের প্রেম করার সংকল্প।

গত এক সপ্তাহ ধরে আশরাফ একটি বিষয়ে খুব করে চিন্তা করছে। জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সে। পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা তিন বেলা ভালকরে পেট পুরে খাওয়া, সংসার ধর্ম, আনন্দ-বিনোদন ইত্যাদি করার জন্যই মানব জাতিকে পাঠাননি বরং মানব সন্তানদের একটি বিশেষ দায়িত্ব দিয়েই এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর তা হল- আল্লাহর এই পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশিত আইন কানুনের মাধ্যমে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে একটি শান্তিময় সমাজ গড়ে তুলা। এসব কিছু নয়ন এতদিন ধরে সজলের সাথে উঠাবসার করার দরুণ আল-কোরআন,হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করার ফলে অনুধাবন করতে পেরেছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে যেসব লোকজন তাদের জীবনকে কাটিয়ে দিচ্ছেন তাদের দলে শামিল হতে চাচ্ছে আশরাফ। একটি সাম্য ও ন্যায়ের আদর্শকে আশরাফ তার জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে চাচ্ছে। গত দুদিন যাবৎ এ নিয়ে চিন্তা করার ফলে তার মাথা ভারী হয়ে উঠছে।
যাহোক, অবশেষে আশরাফ দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তাকে এই সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যে করেই হোক শামিল হতে হবে।
এখন থেকে আশারাফ শুধু একজন আশরাফ নয়। তার অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। তাকে অনেক বিষয় পড়াশোনা করতে হয়। অনেক বিষয়

নিয়া চিন্তা করতে হয়। ধর্ম, দেশ ও জাতি সর্বস্থানে কীভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় এ নিয়েই কেবল তার ভাবনা। অসহায় বঞ্চিত লোকদের কীভাবে তাদের করুণ অবস্থা থেকে উত্তরণ করা যায়, দুর্নীতি-অন্যায়-জুলুম থেকে কীভাবে জাতিকে মুক্তি দেয়া যায়; এসব বিষয় নিয়ে দিন-রাত মগ্ন থাকে আশরাফ।

এতদিন আশরাফ তার যেভাবে চলা ফেরা করেছে তাতেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। কথা-বার্তায়ও এসেছে অন্য সাধারণ ছাত্রদের থেকে ভিন্নতা। তার কোন বন্ধু অন্যায় কাজ করলে আগের মত এড়িয়ে চলে যায় না বরং অন্যায় থেকে ফিরানো সুযোগ থাকলে ফিরানোর চেষ্টা করে অথবা মনে মনে অনেক কষ্ট অনুভব করে। সর্বোপরি কীভাবে সবার মধ্যে সঠিক চেতনা ও সুস্থ ধ্যান ধারণা প্রবেশ করাতে পারে এই চিন্তা আশরাফেকে সর্বদাই ঘিরে রাখে।

.

চলছে রনি, সজল, আশরাফ ও নয়নের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের তৃতীয় বর্ষ। চারজনের লক্ষ্য চারদিকে। প্রতিজনেই নির্দিষ্ট একটি সময়ের পর কিছু পেতে চায়। তবে চাওয়ার বস্তু তাদের ভিন্ন। রনি ডিপার্টমেন্টে যেই ইয়ারের ছাত্রই হোক না কেন হলের মধ্যে সে তৃতীয় বর্ষের একজন সিনিয়ন বড় ভাই। তার অনেক গাম্ভীর্য আছে চলাফেরায়।

এক সপ্তাহ পর সরকারী দলের ছাত্রসংগঠনের নতুন করে কমিটি দেয়া হবে। ভিতরে ভিতরে পদ প্রত্যাশীরা চাপা উত্তেজনায় ভোগছে। কে যে কী পদ পায়, কে আবার বঞ্চিত হয়; এসব নিয়েই সারাক্ষণ কথাবার্তা চলে সবার মধ্যে। রনির একটা নিশ্চয়তার জায়গা আছে; কারণ সে অনেক সূত্র ধরে অনেক বড় বড় নেতার খুব কাছে ঘেষতে পেরেছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় যে সূত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেটি হল- বোতলজাত দ্রব্যের আদান প্রদান। গত প্রায় একবছরের চেয়ে একটু বেশি সময়ে ক্যাম্পাসে যত বোতলজাত দ্রব্য আমদানী-রপতানী

হয়েছে তার সিংহভাগই রনির হাত দিয়েই। তাই নেটওয়ার্কিংটাও বেশ জটিল ও শক্ত।

কমিটি দেয়া হলে রনি হলের সরকারী ছাত্র সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক এর পদ লাভ করে। চারদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রনিকে নিয়ে অভিনন্দন প্রতিক্রিয়ার সয়লাভ ঘটে। রনিও তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে সিক্ত হয়ে নিজেকে অদৃশ্য ডানায় ভর করিয়ে হাওয়ায় উড়াচ্ছিলেন। এতদিন যে কোন ন্যায়-অন্যায় করার আগে রনি অন্য কারোর রেফারেন্স দিয়ে করত কিন্তু এখন রনির রেফারেন্স দিয়ে লোকজন ন্যায়-অন্যায় সম্পাদন করে।

এদিকে সরকারী ছাত্র সংগঠনের হলের সভাপতির মেয়াদ নতুন কমিটি দেয়ার সাথে সাথে বাতিল বলে ষোষিত হয়েছে। হলের সভাপতি এখন কেন্দ্রীয় কমিটির পদপ্রার্থী। কেন্দ্রীয় কমিটিতে পদ পাওয়ার জন্য হাজার হাজার নেতা কর্মীরা ঝটলা পাকায়। হাজার হাজার পদপ্রার্থীদের মধ্য থেকে কিছু নেতা কর্মী পদ লাভ করবে। আর দল ক্ষমতায় থাকলে প্রতিযোগিতার ঠেলাঠেলিটা একটু বেড়ে যায়। রনির সাবেক সভাপতি; যার হাত ধরেই সে তার জীবনে অনেক বড় বড় কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে সেই লোকটিও আজ আশা ও ভয়ের মাঝে দিনাপাত করছে। ভাল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভের আশায় দিন রাত উপরের নেতাদের পেছনে ঘুর ঘুর করছে। কোন জিনিস পাওয়া এত সহজ নয়; হোক জিনিসটা ভাল কী মন্দ। যেই জিনিসের পেছনে শ্রম দেয়া হবে সেটার একটা ফল আসবেই; হোক সেটা ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক।

কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করেছে। অনেক উৎকণ্ঠার পর রনির রাজনৈতিক গুরু কেন্দ্রীয় কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেছে- কেন্দ্রের ১নং সাংগঠনিক সম্পাদক। রনির রাজনৈতিক পরিসর এখন আরো বেড়ে

গিয়েছে। রনি এতদিন রাজনীতি নিয়ে যে আশা ভরসা করতেন এখন তার দৈর্ঘ-প্রস্থ আগের অবস্থানে নেই। বিশেষ করে হোসেন ভাই কেন্দ্রের পদ লাভের পর রনির স্বপ্নটা সাই সাই করে উপরে উঠে যায়। লাল-নীল অনেক স্বপ্নের মধ্যে বিভোর হয়ে পড়ে সে।

এক মাস পর ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।সময় খুবই কাছাকাছি । চারদিকে তুলকালাম শুরু হয়ে গেছে। যে কোন রাজনৈতিক দলের যে ছাত্র সংগঠন থাকে; এটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় নির্বাচনকালীন সময়ে। আমাদের দেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেসব কালচার বা ট্রেডিশন প্রচলিত আছে সেগুলোকে সুচারু রূপে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এসব ছাত্র সংগঠনগুলো সবচেয়ে বেশি কার্যকর। ক্ষমতাসীন দল, বিরোধী দল সবাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট অকৃপণ। আর ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মীরা এমন নির্বাচন কেন্দ্রীক আয়োজনের অপেক্ষায় থাকে; কারণ এতে করে তাদের একটা আয় রোজগারের ওয়াসিলা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন সবচেয়ে বেশি ফায়দা হাসিল করতে পারে। তাদের রোজগারের উৎস অনেক মজবুত থাকে। তাদের পায়ের নিচের মাঠি থাকে অনেক শক্ত।
ঢাকা সিটির নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হওয়ার কথা নয়। সরকারী ও বিরোধী দল সবারই গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট এটি। দেশের রাজধানী হিসাবে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলার অপেক্ষা রাখেনা। নির্বাচন আরো কাছে ঘনিয়ে আসলে অন্যান্য এলাকার ছাত্রসংগঠনের চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠন একটু বেশি তৎপর হয়ে উঠে। দায়িত্বের ভাগাভাগির ফলে রনির কাঁধেও আসে একটি ভাগ। রনির রাজনৈতিক গুরু (তার হলের সাবেক সভাপতি) কেন্দ্রে পদ পাওয়ার পর রনির পরিচিতিটা স্বাভাবিকভাবেই আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। তাই

অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তার হাতে এসেছে। খুব খেয়াল করে এসব কিছু তাকে আঞ্জাম দিতে হবে।

আর বিশেষ করে এবার সরকারী দল থেকে যিনি প্রার্থী মনোনিত হয়েছেন তিনি আবার কীভাবে যেন রনির রাজনৈতিক গুরুর আত্মীয় হোন। তাই গুরুত্বটা আরো বেড়ে গেল রনির কাছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে বোতলজাত পণ্যের মার্কেটও বেশ রমরমা হয়। লোকজন তো আর এমনে এমনে কাজ করবে না; শরীরে শক্তি না থাকলে কি কোন কাজ হয়?

মাঠে নেমে যায় রনি। নির্বাচনের ওয়ার্ক দিন-রাত ব্যাপি হলেও তাতে অনেক মজা আছে। অনেক বড় বড় নেতাদের সাথে চলাফেরার মধ্যে যে গাম্ভীর্য ভাব তৈয়ার হয়; সেই ভাব অনেক কিছু ত্যাগ করেও অর্জন করা যায় না।

দেখতে দেখতে চলে গেল দিনগুলি। কালই নির্বাচন। রনির দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ পাশের যেসব এলাকায় ভোট গ্রহণ হবে সেসব কেন্দ্রগুলোকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা। তার বিশাল হলের শত শত জুনিয়র ছোট ভাই আছে। তাদের সকলকে আগের রাতে রনি তার রুমে কয়েক ভাগে ডেকে আলাদা করে বিশেষভাবে বলে দিয়েছে কেমনে কী করতে হবে। কোন পরিস্থিতিতে কীভবে সবকিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে। অবশ্য রনির জীবনের বিগত দিনগুলোতে এমন অবিজ্ঞতা কখনো হয়নি। রনি আজ শত শত ছেলে পেলেকে এত বড় একটি কাজের জন্য দিক নির্দেশনা দিচ্ছে অথচ সে নিজে কোন দিন এমন কাজ চোখেও দেখেনি। পরিস্থিতি, পরিবেশ মানুষকে অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়; যার জন্য পূর্ব অবিজ্ঞতার কোন প্রয়োজন হয় না।

নির্বাচনের দিন সকাল বেলা। সবাই প্রস্তুত। রনির সহযোগিতায় শুধু হলের জুনিয়র ছেলেরা নয়। সরকারী আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরাও নীরব সমর্থক। তাই ডর-ভয়টা নেই বললেও চলে। শত শত ছেলে রনির

কথায় নির্বাচনের কেন্দ্রে এত সহজে চলে আসারও এই কারণটা প্রধান হিসাবে কাজ করেছে।

গত রাতের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী রনি ও তার বেসরকারী ফোর্স প্রথম কাজ সম্পন্ন করে কেন্দ্র দখলের মাধ্যমে। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে বিলীন করা যায়। তাই রনি অভিযানকে সফল করতে গিয়ে কয়েকজন ভোট গ্রহণকারী শিক্ষক ও অফিসারদের মারধর করতে হয়েছে। দেশের কল্যাণে, দলের স্বার্থে এমন কাজ মন্দ নয় হয়ত।

কেন্দ্র দখল করে রনিবাহিনী সরকারী দলের প্রার্থীকে জয়লাভের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা করার দরকার কোন কিছুই বাকি রাখেনি। কাজ শেষে ছেলেরা যখন হলে ফিরে তখন পরস্পর বলাবলি করছিল এবং হেসে একে অপরের উপর ঢলে পড়ছিল। তন্মধ্যে একজন প্রথম বর্ষের ছাত্রের কথায় সবাই একটু বেশি আনন্দ পায়- 'আমি ভোটার হব আরো দুই বছর পর কিন্তু আল্লাহর কি রহমত আমার উপর! লোকজন ভোটার হওয়ার পরও যেখানে ভোট দিতে পারলনা আর আমি এক ঘন্টায় দুইশত ভোটা দিয়ে দিলাম। হা হা হা আমি আমার ছেলে পেলে নাতি নাতনীদের মরার আগে বলে যামু, তোরা জীবনে ভোট দিতে হবে না আমি যা জীবনে দিছি এগুলোই যথেষ্ট।' তবে ভোটার সৈনিকদের যে যাই বলুক না কেন তাদের মুখের সর্বশেষ কথা ছিল রনিকে নিয়েই- 'রনি ভাই অনেক সাহসী একটা লোক রে!'

.

নির্বাচনের পর শান্ত শান্ত একটা ভাব সৃষ্টি হয় হলের মধ্যে। কেমন যেন এক নীরব পরিবেশ চলছিল। কোন হাঁক ডাক নেই। প্রোগ্রাম, মিছিল, মিটিং এর কোন প্যারা নেই ছাত্রদের মাঝে। আঁধার যখন ঘুটঘুটে আকার ধারণ করে আলো তখন কাছে আসে। অধিক নীরবতার মানে হল কোন একটা হাঙ্গামা অচিরেই ধেয়ে আসছে।

নয়ন আর তার বন্ধুরা মিলে একদিন আড্ডা দিচ্ছিল হলের ভিতর লেকের পাড়ে বসে। নয়নের বাবা যে বর্তমান সরকারের চেতনা বিরোধী রাজনীতির সাথে যুক্ত এটা তার বন্ধুরা কেউ জানে না। তিন বছন শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই খবরটা একজনের কাছেও ধরা দেয়নি। নয়নের বাবা কারাগারে দীর্ঘ দিন বন্দী ছিল; তখন অবশ্য তার মন খারাপ থাকত মাঝে মাঝে কিন্তু তার বন্ধুরা কারণ জানতে চাইলে প্রতিবারই একটা হাসি দিয়া অন্য প্রসঙ্গে কথা চালান করত।

সেদিন আড্ডার মাঝে হঠাৎ রনি উপস্থিত। প্রথম বর্ষে যখন প্রথম তারা হলে উঠে তখন রনি তাদের সাথে বেশ সখ্যতা জমিয়েছিল। কিন্তু হল থেকে বহিস্কার হওয়ার পর থেকে রনি এবং তার বন্ধুদের মধ্যে একটা ছেদ পড়ে। রনির বন্ধু সার্কেল গড়ে উঠে অন্য জগতে। যাহোক, রনির আগমনে নয়ন ও তার বন্ধুরা একটু নড়ে চড়ে উঠে। সে তো তাদের সাথে দীর্ঘ দিন যাবৎ আড্ডা দেয় না, দেখা হলেও তো কথা বার্তা হয় না তার সাথে। কেমন যেন ক্ষিপ্রতা লক্ষ করা যাচ্ছে তার মধ্যে। একদম কাছাকাছি চলে আসছে রনি। এসেই নয়নকে লক্ষ করে বলে-
: কিরে, তোর বাবা নাকি এমন এমন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত? তুইও নাকি এসব করিস? জানিস না হলে থাকলে এসব করা যায় না? যা মন চায় করবি কিন্তু হলে কেন? এক শ্বাসে রনি বলে যাচ্ছে।
নয়ন কিছুটা ভীতির চেহারা নিয়ে রনিকে বলছে-
: দেখ, উল্টা পাল্টা কী বলছিস এসব? ভাল করে জেনে তারপর কথা বলবি। হুম----
রনির মাথা আরো গরম হয়ে গেল। কথার উত্তর দিতে গিয়ে সে ততক্ষণাৎ নয়নের গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়। বন্ধুরা সবাই হা করে তাকিয়ে আছে। রাগে তার মাথার চুল যেন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে-
: শালা, তোর হাত পা ভেঙ্গে পুলিশের কাছে তুলে দিলাম না বন্ধু বলে। আবার তুই বলিস আমি না জেনে কথা বলতেছি? যা বলছি সব দলিল

প্রমাণ নিয়েই বলছি। দেখিসনি কয়দিন আগে একটারে কীভাবে হাত পা ভেঙ্গে হল থেকে বের করলাম? তোর কপাল ভাল তুই একসময় আমার ভাল বন্ধু ছিলি।
রনির আচরণে মনে হচ্ছিল প্রাধ্যক্ষ তাকে হলের যাবতীয় দায়িত্ব দিয়ে কিছু দিনের জন্য অবকাশ যাপন করতে গিয়েছেন অন্য কোন গ্রহে। রনির সর্বশেষ কথা ছিল পাঁচ মিনিটের মধ্যে যেন নয়ন হল থেকে সবকিছু নিয়ে বের হয়ে যায়। নয়নের হলে থাকার জীবন এখানেই সমাপ্ত হয়। আর কোন দিন হলে আসতে পারেনি সে। তবে নয়নের কাছে একটি ব্যাপার রহস্য হয়ে আছে- সে তো সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে যেন হলের জীবনটা অনেক সুখে কাটে। কোন বাধা-বিঘ্ন বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়। তার পূর্বের জীবন ছাড়তে গিয়ে তাকে কতকিছুই না বাদ দিতে হয়েছিল! তাহলে কি সে দুই কূল হারিয়েছে? এখন কি আবার আগের পবিত্র জীবনে ফিরে যাওয়া সম্ভব?

.

রনি, সজল, নয়ন ও আশরাফ। চলছে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় বর্ষের জীবন। কিন্তু রনির ক্ষেত্রে এটা পুরোপুরি সত্য নয়। ইয়ার ড্রপ, বহিস্কার সহ নানান কিছুর বেড়াজালে রনি কোন ইয়ারের ছাত্র এটা এত সহজে বলে দেয়া মুশকিল। আদৌ তার নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় ছাত্র হিসাবে আছে কি না সেটাও এখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সজল প্রথম বর্ষ থেকেই ডিপার্টমেন্টে প্রথম স্থান ধরে রেখেছে। আইন-বিচার নিয়ে তার উচ্চতর গবেষণা করাই জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
আশরাফের রেজাল্ট মোটামোটি হলেও বিভিন্ন বিষয়ে তার অগাধ পড়াশোনা। আর চাকুরির ক্ষেত্রে আশারাফের ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল সে ‘বিচারক’ হবে। তার বাবা একজন ছোট-খাট আইনজীবী; তাই বাবারও এব্যাপারে আগ্রহটা একটু বেশি ছিল। আশরাফ যা কিছুই করুক

পাশাপাশি তার জীবনের স্বপ্ন পূরণের জন্য যতটুকু প্রস্তুতি নেয়া দরকার তা যথাযত নিচ্ছে।
নয়নের হতাশা যেন কাটছেনা কোনক্রমেই। চারদিক থেকে অন্ধকার তাকে ঘিরে রেখেছে। হল থেকে বের হওয়ার পর দুর্দশা আরো বেড়ে গিয়েছে তার। বাড়ির সাথে তেমন ভাল সম্পর্ক না রেখে এতদিন হলে ভালভাবে থাকতে পারলেও এখন সে পড়েছে অথৈই সাগরে। মেসে থাকার খরচ অনেক; মানে হলের তুলনায় মেসের ব্যয় অকল্পনীয়। মাঝে মাঝে চিন্তা করে পড়াশোনা বাদ দিয়ে অন্য কিছু শুরু করে দিবে। আবার পরক্ষণেই চিন্তা করে, নাহ! যে করেই হোক তাকে অন্তত অনার্স এর সার্টিফিকেটটা নিতে হবে।

দেখতে দেখতে কেটে যায় আরো একটি বছর। এতদিন রনির শিক্ষাবর্ষ কোনটি জানা না থাকলেও কিছুদিন আগে সে নিজেকে কোন ইয়ারের ছাত্র সেটা আবিস্কার করতে পেরেছে। সবাই যখন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র রনি তখন দ্বিতীয় বর্ষের। রনির জন্য অবশ্য এটা অনেক সুবিধা হয়েছে। কারণ, এমন সুযোগেই সে অনেক অনেক বড় কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। যদি অন্যদের মত তার প্রতিদিন ক্লাসে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা লাগত তাহলে রাজনৈতিক ময়দানে তার এত দূর আগানোর স্বপ্নটা উদয় হত না। রনির মাথায় রাত- দিন এখন অনেক বড় রাজনৈতিক স্বপ্ন ঘুরপাক খায়। এসব পড়াশোনা করে কী করবে সে।

কাল থেকে মাস্টার্স এর ক্লাস শুরু। পরিস্থিতি কখনো সময়ের চাকার সাথে ঘুরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের অনুকূলে চলে আসে। বন্ধুরা সবাই

যখন বিসিএস, ব্যাংক সহ বিভিন্ন চাকুরি নিয়ে মশগুল, রনি তখন রাজনৈতিক স্বপ্নের মধ্যখানে অবস্থান করছে। স্বপ্নের চির স্বাদ আস্বাদনে ব্যস্ত সে। দশ দিন পর সরকারী দলের ছাত্রসংগঠনের নতুন করে কমিটি দিবে। আগের কমিটিতে রনি পদ ছিল সাংগঠনিক সম্পাদক। এতদিনে রনির রাজনৈতিক লিংক যে কোন পর্যায়ে উঠেছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। হলের সবচেয়ে প্রভাবশালী বড় নেতায় পরিণত হয়েছে রনি। জুনিয়র সিনিয়র সবার মুখে শুধু এখন রনির নাম। এমন পরিচিতিকে রনি কোনভাবেই হাতাছাড়া করবে না। আর অনেক আগ থেকেই তো একটি তার রাজনৈতিক স্বপ্ন গজিয়েছিল; তা পূরণ হওয়ার পয়লা স্তর এটাকে বলা যেতে পারে।

হলের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে রনির অবস্থান সবচেয়ে আগে। লবিং এর দিক দিয়েও সবচেয়ে বেশি শক্ত অবস্থানে সে। সূর্যসেন হলের সভাপতি এবার রনিই হবে। বুলেট মিস হতে পারে এটা মিস হবে না। চলাফেরা ও ভাবগতিও অন্যরক হয়ে গেল তার। এক এক সপ্তাহ পরই তো ফলাফল চলে আসবে; কে হতে যাচ্ছে হলের সভাপতি। নীলক্ষেতের এক প্রেসের সাথে রনির আগেই পরিচিত ছিল। তাকে ফোন করে বলে রেখেছে চারপাঁচ দিন পর অনেক বড় একটা কাজ করে দিতে হবে; মানে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সেক্রেটারিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কয়েকশত পোস্টার করতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।
কাল সকাল বাদে দুপুর হতেই চূড়ান্ত ফলাফর চলে আসবে। রনি তার রাজনৈতিক গুরুর মারফতে জানতে পেরেছে ঘোষণা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে এখন শুধু আনুষ্ঠানিকতাটা বাকি। মানে রনিই হয়ে গেল হলের সভাপতি।
সবকিছু শেষ হয়ে গেলেও রাজনীতিতে শেষ বলতে কোন কিছু নেই সেটা রনি বহুত শুনেছে কিন্তু সেটা যে রনির ক্ষেত্রেও ঘটবে কে জানত। সবকিছু

ফাইনাল হয়েছে বাকি শুধু আনুষ্ঠানিকতা। এই আনুষ্ঠানিকতার ফাঁকে দিয়ে ঘটে গেল বিশাল এক দুর্ঘটনা।
সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর আপন ভাগ্নে। হলে কিছু দিন ছিল। প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষে প্রাধ্যক্ষ এর বিশেষ নির্দেশে সে একটি রুমে থাকত। মাঝে মাঝে পলিটিক্যাল প্রোগ্রামে যাইত। তৃতীয় বর্ষে উঠার পর হল রাজনীতির সাথে সব রকমের সম্পৃক্তা বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় রাজনীতির সাথে বিশেষ সম্পর্কের খাতিরে যুক্ত হয়। হলের সভাপতি রনিকেই বানিয়েছিল উপরের মহল। কিন্তু কমিটি ঘোষণা হওয়ার আগের দিন মন্ত্রীর একটি ফোনকলে সবকিছু উলটপালট হয়ে যায়।

হলে রনির অনেক সমর্থক। বেশিরভাগ ছেলেপেলে রনিকেই চিনে। মন্ত্রীর ভাগ্নেকে কেউ চিনেনা। কিন্তু তাই বলে যে তার কোন সমর্থক হলে নেই এমনটা নয়। এতদিন ছিলনা এটা সত্য তবে একরাতেই রনির সমর্থনে ভাটা পড়ে যায়। পরের দিন সকাল বেলা মন্ত্রীর ভাগ্নে হলের সকল ছেলেপেলেদের নিয়ে মধুর ক্যান্টিনে বিশাল এক মিছিল নিয়ে উপস্থিত হয়।
রাগ আর অভিমানে রনির মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। এতবড় হোঁচট সে কোন দিন খায়নি। এটাকে সে কী দিয়ে সামাল দিবে? এমন ট্রাজেডিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গতরাতে রনি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বোতলজাত দ্রব্য গিলতে হয়েছে। মনে হয় যেন এটাই তার সর্বশেষ সমাধান ও পরম বন্ধু।

রনির রাজনৈতিক গুরু ফোন রিসিভ করছে না। রনিও দুই তিনটা ফোন দিয়ে আর যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি। প্রথম হোঁচটেই রাজনীতির প্রতি চরম ঘৃণা তৈরি হয়েছে তার। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা মানুষ করতে পারে! সেই প্রথম বর্ষ থেকে নিজের জীবন বাজি রেখে রনি কত উপকারই না করল! কিন্তু উপকারের ফলাফল বুঝি এমনই হয়! রাজনীতিতে

‘ব্যবহার’ বলতে একটা কথা আছে; উপরের লোকেরা নিচের লোকদের ব্যবহার করে থাকে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য। এই ব্যবহার সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যমান। কিন্তু রাজনীতিতে ব্যবহারের মাত্রাটা এতটাই নিষ্ঠুর হতে পারে সেটা রনি টের পেয়েছিল হারে হারে।

রনির প্রতি নতুন সভাপতি তথা মন্ত্রীর ভাগ্নের কোন ক্ষোভ নেই। সে রনির নামই শুনেছে সভাপতি হওয়ার পর; রনি নামের একটা ছেলে আছে সে সভাপতি হওয়ার কথা ছিল; তার অনেক জনপ্রিয়তা ও পরিচিতি। কিন্তু কাল হয়ে দাঁড়ার একসময়ের রনিরই কিছু দুধের মাছি ঘরাণার রাজনৈতিক হেল্পার। যারা সবসময় রনির পাশে থাকত। রনিকে নিয়ে সদা জল্পনা কল্পনা করত। আজ তারা তাদের প্রকৃত পরিচয় দিচ্ছে; আসলে তারা রনিকে কতটুকু ভালবাসত। তারা সবাই এখন নতুন সভাপতির অনুচর। রনির সাথে থেকেই বা লাভ কী? সবাই তাদের প্রকৃত চেহারা সময়মত প্রকাশ করছে, তাহলে রনির প্রকৃত চেহারাটা কী; যেটা সময়মত রনিকেও প্রকাশ করতে হবে? নাকি তার চেহারা কেবল একটিই?

রনির একসময়কার দুধের মাছি টাইপ হেল্পারগণ নতুন সভাপতিকে পরামর্শ দিল-

: ভাই, রনিকে হল থেকে বের করে দেন। হলে এখনো তার অনেক প্রভাব। অনেক ব্যাপার সে ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে। যে কোন মুহূর্তে কোন বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে; যেটা আপনার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে। নতুন সভাপতি বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে নিলেন। পরের দিনই রনিকে হল থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় নতুন সভাপতি। সেকেন্ড ইয়ারের দশ বার জন পলিটিক্যাল ছেলেকে ডেকে সবকিছু বলে নতুন সভাপতি; কেমনে কী করতে হবে। এই দিন রাতেই ছেলেরা নির্দেশনা অনুযায়ী রনির রুমের সামনে হাজির। রাত তখন একটা এবং দুইটার মাঝামাঝি। তখন রনি বোতলজাত দ্রব্য গ্রহণে

ব্যস্ত থাকে; এটা হলের প্রতিটা ধূলি কণাও জানে। কিছু আইন রিজার্ভ করা থাকে; যেগুলো বিশেষ সময়ে বিশেষ লোকের জন্য কাজে লাগে। হলে মাদকদ্রব্য সেবন আইনত অপরাধ। দরজার সামনে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে অবস্থা অনুমান করে ছেলেপেলেরা এক ধাক্কা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। বোতলসহ রনিকে এক হেচকা টান দিয়ে বারান্দায় নিয়ে আসে। চার-পাঁচ সেকেন্ডে চাঁর-পাঁচশ কিল-ঘুষি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে হলের বাহিরে নিয়ে যায় তাকে। হলের সামনে আগের দিনের পরিকল্পনা অনুযায়ী পুলিশ অবস্থান করছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের সকল থানার সকল পুলিশ রনিকে এক নামেই চিনত। তারপরও কিছু করার নেই। রনির সবকিছু এখন শূন্যের কাতারে নেমে গিয়েছে। তারপরেও রনি দুদিন পরেই থানা থেকে ছাড়া পেয়ে যায়; সেটা রনির ক্ষমতার জোরে নয় বরং নতুন সভাপতিই বলে রেখেছিল তাকে দুইদিন পর যেন ছেড়ে দেয়া হয়। নতুন সভাপতি রনিকে জেলে দেয়ার কোন ইচ্ছা ছিলনা তথা হল থেকে বের করার একটা সহজ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গিয়ে এমনটা করতে হয়েছে। সবকিছু এখানে সমাপ্ত হয়ে যায় রনির। আর কোন আশা ভরসা বলে পৃথিবীতে কিছুই রইলনা।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর মধুর ক্যান্টিন অতিক্রম করছিল রনি। পথিমধ্যে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় রনির ঐ রাজনৈতিক গুরুর (হোসেন ভাই) সাথে। রনি প্রথমে চেয়েছিল তাকে এড়িয়ে চলে যাবে। কিন্তু সম্ভব হয়নি। তাকে দেখেই রনির ঘৃণার মাত্রা একশ থেকে একহাজারে উঠে যায়। একগাল হাসি দিয়ে রাজনৈতিক গুরু হোসেন ভাই রনিকে বলে,
: মন খারাপ করিস না, ধৈর্য ধর। ধৈর্যর ফলাফল অনেক বড় হয়। দেখি তোরে কেন্দ্রীয় কমিটিতে একটা ভাল পোস্ট দেয়ার ব্যবস্থা করব। মানে মূল কমিটি হয়ে গেছে তাতে কী হয়েছে। এক্সটেনশন কমিটি তো আছে।

তার কথাগুলো রনির বুকে বিষের মত বিঁধে যাচিছল। কোন ‘হ্যাঁ-না’ উত্তর না দিয়ে রনি সামনে হাটতে শুরু করে। পিছনে একবারও ফিরে তাকায়নি। তাকে সভাপতির পদ দিবে বলে দিলনা! তারপর তাকে হল থেকে এভাবে অপমানিত করে বের করে দিল! জীবনটা রেখে আর লাভ কী? কিন্তু নাহ, জীবন যুদ্ধের সাথে এভাবে হেরে গেলে চলবেনা। প্রয়োজনে আবার তাকে শুরু করতে হবে প্রথম থেকে। তবে রাজনীতির স্বপ্ন দেখা থেকে সে চিরকালের জন্য নিজেকে মুক্ত রাখতে চায়।

আবার পড়াশোনা শুরু করে রনি। পরিচিত একবন্ধুর সাথে মেসে উঠে সে। সবকিছুই অপরিচিত হয়ে গিয়েছে এতদিনে। হলে থাকাকালে থানা থেকে একটা মোটরসাইকেল কোন এক উপায়ে সংগ্রহ করেছিল। যেসব মোটরসাইকেল লাইসেন্স থাকেনা পুলিশ জব্দ করে রাস্তা থেকে থানায় নিয়ে আটক করে, মামলা দেয় ইত্যাদি। থানা থেকে আবার বিশেষ ব্যক্তিবর্গ বিশেষ উপায়ে এসব পরিত্যক্ত জিনিসের উপর ভাগ বসায়। পুলিশ থেকে প্রাপ্ত রনির সেই উপহার পণ্যটি বিক্রি করে তার বিপদের ধাক্কা কিছুটা সামলাতে সক্ষম হয়।

একটা চাকুরির গাইড কিনে রনি। একটা শপিং ব্যাগে বইটি নিয়ে প্রতিদিন লাইব্রেরিতে আসে। একলাইন পড়ার পর দশ মিনিট তাকে তার পূর্বজীবনের স্মৃতিচারণ করতে হয়। কী হয়ে গেল তার জীবনে! কী হওয়া কথা ছিল, আর কী ঘটল! এই করতে করতে তার লাইব্রেরিতে সময় কাটে।

মাস খানেক পর রনির কাছে ডিপার্টমেন্ট খবর আসে। ডিপার্টমেন্টে গিয়ে নোটিশবোর্ডে একটি নোটিশ দেখে রনির পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায়। আকাশ ভেঙ্গে পড়ে মাথার উপর। নোটিশের মধ্যে রনির নাম আর নিচে কয়েকটি স্বাক্ষর।

“বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি ইয়ার লস হওয়ার কারণে রনির ছাত্রত্ব বাতিল।” রনির সামনে আর কোন উপায় বা পথ খোলা নেই। সবদিক থেকে তার পথ ও পন্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আবারও সেই বটতলায় চলে আসে রনি। মাথাটা নিচু করে বসে থাকে কতক্ষণ। কোন কিছুই মাথায় আসছেনা। একবার ভাবছে ভিসি স্যার বরাবর একটা দরখাস্ত দিবে এবং তার জীবনের সবকিছু খুলে বলবে। আবার ভাবছে নাহ কিছুই করবে না সে। তাকে অন্য পথে এগুতে হবে। এই ছোট্ট জীবনের অভিজ্ঞতার ডায়েরিতে তার বহু জিনিস জমা হয়েছে। এসব দিয়ে চাইলে অনেক কিছুই সে করতে পারবে।

মেসে যে বন্ধুর সাথে সে উঠেছে তার সাথে সবকিছু সবকিছু শেয়ার করে রনি। তার পরামর্শে রনি একটি ‘টিউশন মিডিয়া’ দিয়ে কাজ শুরু করার চিন্তা করে। টিউশন মিডিয়ার কাজ হল- ছাত্রদের টিউটর ও টিউটরদের ছাত্র খোঁজ করে দেয়া। একটু লেগে থাকলে মোটামোটি ভাল ইনকাম আছে। অন্তত নিজের পকেট ভালকরেই চলে যায়। পরদিন প্রয়োজনীয় সব উপাদান রেডি করে রনি টিউশান মিডিয়ার কাজে নেমে যায়। প্রথম কিছুদিন বেশ দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে তাকে। প্রথম দিকে সাড়াও পাওয়া গেছে অনেক অল্প। কিন্তু কয়েকমাস যাওয়ার পর প্রত্যাশিত লেভেলে কার্যক্রম চলছিল রনির টিউশন মিডিয়া। বাড়ির সাথে তেমন যোগাযোগ নেই তার। স্বপ্ন এখন একটাই- কিছু একটা করে তারপর বাড়ি যাবে। কিছুএকটা যে পড়াশোনাই করতে হবে তাতো নয়; করার মত অনেক কিছুই আছে এই পৃথিবীতে। স্বপ্ন দেখে আর জীবনের সাথে যুদ্ধ করেই তো তাকে এ পর্যন্ত আসতে হয়েছে।

.

মাস্টার্স এর রেজাল্ট হয়েছে। সজল অনার্সের ন্যায় এবারও প্রথম স্থান অর্জন করেছে। শুধু প্রথমই নয় ডিপার্টমেন্টের ইতিহাসে সেরা রেজাল্ট বলা যেতে পারে। আশরাফ অনার্স এর পরই জুডিশিয়ারি পরীক্ষা দিয়েছিল তার দুইটা ফলাফল একসাথে হয়েছে। একদিকে মাস্টার্স অপরদিকে জুডিশিয়ারি। দুটাতেই ভাল করেছে। সে তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন করে ফেলেছে বলা যায়; মানে জাজ হিসাবে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছে। হল থেকে বের হওয়ার পর নয়নকে এই দুই একবছর ক্যাম্পাসে বেশি দেখা যায়নি। মাঝে মাঝে ক্লাসে আসত। বেশিরভাগ সময় বাহিরেই কাটাত। কোথায় কীভাবে সেটা কেউ জানেনা। পরে শুনা যায় সে নাকি মাস্টার্সে ভর্তি হয়নি। তবে অনার্সের রেজাল্ট যে খারাপ ছিল এমন নয়।

ডিপার্টমেন্টে শিক্ষক নিয়োগ চলছে। সঠিক বিচারে নিয়োগ হলে সজলই সবচেয়ে বেশি যোগ্য। এপ্লিকেশনও করেছে সজল। কিন্তু তার রাজনৈতিক মতাদর্শে নাকি সমস্যা। এ নিয়ে শিক্ষকরা দুই ভাগ হয়ে যায়। অধিকাংশ শিক্ষকারই সজলকে নিয়োগ দেয়ার পক্ষে। গুটিকয়েক গুটিবাজ শিক্ষক সজলকে দুই চোখে দেখতে পারে না। তারা অনেক চেষ্টা করেছিল সজলের রেজাল্ট ডাওন করে দেয়ার জন্য। কিন্তু সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে এখন তো কোনভাবেই সজলকে নিয়োগ দেয়া যাবেনা। বিষয়টা ডিপার্টমেন্ট অতপর ভিসির গণ্ডি অতিক্রম করে আরো উপরে চলে যায়। তাই সজল অবশেষে আইন বিভাগের ছাত্র হয়েও সঠিক আইন দারা বিবেচিত হলনা। এ নিয়ে সজলের বিন্দুমাত্রও ক্ষোভ-অভিমান নেই। অনার্স শেষ করার পরই সে মাস্টার্স এর জন্য ইউরোপের একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এপ্লাই করে রেখেছিল। ওখান থেকে ফুল-স্কলারশিপে সজলকে মাস্টার্স করার জন্য ইনভাইট করে। দেশের মানুষের কাছে যদি মূল্যায়ন না পাওয়া যায় তো কী করার। যে দেশে মানুষ সঠিক জিনিসের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে সেদেশেই সজল পাড়ি জমায়।

.

দুই বছর পর-----

সজল দেশে ফিরেছে। দেশের ফিরার পরই সজল আশরাফকে ফোন দেয়। ঠিক হয় সময় করে একদিন ক্যাম্পাসে আসবে তারা। কত দিন আগে এই ক্যাম্পাস ছেড়েছে। আশরাফের পোস্টিং চাঁদপুরে। গেল বছর সে বিবাহও করেছে। সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর সামনে থাকতে হবে তাকে। তাই আশরাফ তার বউকে নিয়ে ফজর পড়েই রওয়ানা দেয় ঢাকার উদ্দেশে। যথাসময়ের আগেই পৌঁছে তারা।

সজল বিদেশের যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পড়েছে সেখানেই তাকে অনেকটা জোর করে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে। সে চাইলেও নাকি পাঁচ-সাত বছর শিক্ষকতা না করে সেখান থেকে আসতে পারবে না। অন্তত পি.এইচ.ডি ডিগ্রিটা তাকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধ সজল অগ্রাহ্য করতে পারেনি।

.

নয়ন আর তার বউ দাঁড়িয়ে আছে লাইব্রেরি সামনে। এর মধ্যেই সজল এসে উপস্থিত। দুজনে অনেক্ষণ জড়িয়ে ধরে কোলাকোলি করে। আশরাফের কাঁধে সজলের মাথা ঠেকাতেই পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা আশরাফের বউয়ের দিকে চোখ পড়ে সজলের। অস্ফুট ভাষায় তার সাথেও একরকম কুশল বিনিময় করে সজল। তারা কে কী করে এসব নিয়ে তো কোন কথা বলার প্রয়োজন নেই; কারণ তাদের নিয়মিত একে অপরের সাথে যোগাযোগ হত। অন্যরা কে কী করছে এসব বিষয় নিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জমে উঠে আড্ডা।

তিনজনের হাতে তিনটি চায়ের কাপ। ছোট ছোট পায়ে হাটছে আর কথা বলছে। সজলের ঠোট দুটো চায়ের কাপে আর চোখ দুটো সোজা তাকিয়ে আছে সামনের রাস্তায়। অনেকটা পাথরের মূর্তির মত দেখা যাচিছল তাকে। আশরাফ কথা বলেই যাচ্ছে। আশরাফের বউয়ের দৃষ্টি চায়ের কাপ থেকে সজলের দিকে পড়েছে। হঠাৎ সজলের হাত থেকে চায়ের কাপটি মাটিতে পড়ে যায়। কথা থামিয়ে এবার আশরাফ সজলের প্রতি মনোযোগী হয়। সজলের দৃষ্টি এখনো সামনের রাস্তার দিকে প্রসারিত হয়ে আছে। একটু পর আশরাফও তার চোখ দুটো সজলের সাথে সামনে মেলে দেয়। 'নয়ন' কাঁধে একটি ব্যাগ নিয়ে ধেয়ে আসছে লাইব্রেরির সম্মুখপানে। তার চলনে একটি ক্ষিপ্রতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কোন এক অসাধ্যকে সাধন করার জন্যই যেন এমন গতি তার মধ্যে তৈরি হয়েছে। ধীরে ধীরে আরো কাছে আসতে থাকে। একবারে তাদের সামনে এসে মুখোমুখি হয়ে যায় নয়ন। মাত্র দুই বছর আগে তাদের সাথে নয়নের শেষ সাক্ষাৎ হয়; বেশিদিনের কথা নয়। তারপরেও প্রথমে একটু না চেনার ভান করে ফের কৃত্রিম একটি হাসি দিয়ে নয়ন আশরাফের সাথে কোলাকোলি করে। তারপর সজলের সাথে। সজলের সাথে কোলাকোলি করতে গিয়ে নয়নের মাথা আর উঠাতে পারছিলনা। কোন এক মহাশক্তি যেন তাকে আটকিয়ে রেখেছিল। দীর্ঘসময় অশ্রুপাত করার পর নয়ন তার মাথা উঠায়। তার প্রতিটি অশ্রুর ফোটায় প্রকাশ পেয়েছিল বিগত দিনের ভুলগুলোর অনুশোচনা। সেদিন নয়ন বেশি কথা বলতে পারেনি। কথা বলতে গেলেই যেন একরাশ অশ্রু তার চোখের কোণে এসে জমা হয়। কাঁধের ব্যাগটা লাইব্রেরিতে রেখে নয়ন তাদের সাথে পুরো দিন কাটিয়েছিল।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল। তাদের আলোচনায় রনির কথা আসল। সে এখন কোথায় থাকে, কী করে। রাজনীতির সাথে কি এখনো যুক্ত আছে, নাকি সেবারের পর আর যুক্ত হয়নি। ইত্যাদি। কথা বলতে বলতেই

আশরাফের চোখ পড়ে টেলিফোনের খাম্বার মধ্যে একটি সাইনবোর্ডের দিকে- "রনি টিউশন মিডিয়া"। এটাই যে রনির বিজনেস কে জানত? দীর্ঘদিন পর ওরা মিলিত হয়েছে মনে মনে কিছুটা দুষ্টমিও কাজ করছিল তাদের মধ্যে। সজল কথা বলার ফাঁকেই তার ফোনে সাইনবোর্ডের উল্লেখ থাকা নম্বরটি তুলে নিলেন। সাথে সাথেই ফোন।

সজল: হ্যালো! রনি বলছেন?

রনি: জ্বি হ্যাঁ, বলুন।

সজল: আচ্ছা, আপনি কি অমুক ডিপার্টমেন্টের এত ব্যাচের ছাত্র ছিলেন?

রনি: মানে, মানে আপনি কে বলছেন?

সজল: আমি বলছি, আপনি আগে বলুন তারপর বলছি।

রনি: জ্বি, আমি ঐ ব্যাচের ছাত্র----। রনির কথা শেষ না হতেই সজল হুররে----- বলে একটা লাফ দিয়ে আশরাফের উপর গিয়ে ঢলে পড়ে। ব্যাপারটি কারোর কাছে আর অস্পষ্ট রইলনা। ততক্ষণাৎ সজল আবার ফোন করে রনিকে সব খুলে বলে। তারা এখন টি.এস.সিতে বসে আছে বলে রনিকে দ্রুত আসার জন্য অনুরোধ করে সজল। কোন কিছু না ভেবেই রনি কোনরকম রেডি হয়েই আজিমপুর থেকে রিক্সায় চেপে টি.এস.সিতে এসে হাজির হয়। তার সেই চলার ভঙ্গি এখনো যায়নি। উড়ন্ত গতিতে আসছে রনি। অনেক দূর থেকে সবাই রনির আগমন লক্ষ করছে। রনির আগমনে নয়ন কিছুক্ষণ মুখ গোমরা করে রেখেছিল। রনিও যখন প্রথমে এসে নয়নের সাথে হাত মিলাচ্ছিলেন তখন তার মধ্যে কিছুটা অপরাধবোধ কাজ করছিল।

কথা-বার্তা তাদের শেষ পর্যায়ে। কে কী করছে সবাই সবার ব্যাপারে জেনেছে। কাল নয়নের একটা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে পরীক্ষা আছে। রনিও এইকয়দিন হল টিউশন মিডিয়ার পাশাপাশি একটি কোচিং শুরু করতে যাচ্ছে। আগামীকাল থেকে ক্লাস শুরু হবে; তাই রাতের মধ্যে

তাকে সবকিছু গোছিয়ে রাখতে হবে। সজল দেশে ফিরার পর কোন আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করতে পারেনি; তাকে কাল-পরশুর মধ্যেই সবার সাথে দেখা করতে হবে। আশরাফ বিয়ে করেছে নতুন। তার বউকে শ্বশুর বাড়িতে দিয়ে আসতে হবে কাল; অনেক দিন যাবৎ কাজের ব্যস্ততায় সেই সুযোগটা হয়ে উঠছেনা। চারজনের চাররকম ব্যস্ততা তাদের মিলনস্থল ত্যাগে বাধ্য করেছিল।

চারজনের গন্তব্যও চারদিকে। আল্লাহ হাফেজ বলে হাটা শুরু করেছে প্রত্যেকে তার গন্তব্যপানে। মাগরিবের পর ঈশার সময় হয়েছে। সবকিছুকে ঢেকে দিয়েছে পৃথিবীজুড়ে কালো অন্ধকার। এই অন্ধকারের চাদরে লুকিয়ে পড়েছে চারটি মুখ।

লেখক পরিচিতি

ইমরান মাহমুদ কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলার অন্তর্গত খয়রাবাদ গ্রামে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে আলিম পাস করে ২০১৪-১৫ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে ভর্তি হন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগ থেকে অনার্স সম্পন্ন করে আরবী ভাষাতত্ত্বের উপর মাস্টার্স করছেন। "অবশেষে" তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস হলেও ইতিপূর্বে তিনি ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের উপর অনলাইন মাধ্যমে "কোটা" উপন্যাস লিখে নানান মহলে আলোচিত হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি " সাহিত্যে রাজনীতির প্রভাব : আরবী পদ্য সাহিত্যের আলোকে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ" শিরোনামে একটি গবেষণা পত্রও সম্পন্ন করেন। তার প্রকাশিতব্য আরো কয়েকটি উপন্যাস হল- জার্নি টু প্যারাডাইস, মেসেঞ্জার, চার বোন। তাছাড়া তিনি লেখালেখির পাশাপাশি সাংবাদিকতা ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে কাজ করছেন।